নাট্য : স্বর ও সংলাপ

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

www.amarboi.com

নাট্য : স্বর ও সংলাপ

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ : শ্রীবাস বসাক
পঞ্চম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ডিসেম্বর ২০১৬
চতুর্থ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২১, মে ২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৭, জুলাই ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৫, মার্চ ১৯৯৯
ISBN 984-70124-0044-9

মূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার প্রিয় বাবাকে
জীবন ছিল যাঁর নাট্য আর
নাট্যই ছিল জীবন

স্বর্গত লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ কথা

সোসাইটি ফর এডুকেশন ইন থিয়েটার পরিচালিত 'থিয়েটার স্কুল'-এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা স্বর ও সংলাপের ওপর এমন একটি সহায়ক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যা তরুণ নাট্যশিক্ষার্থীদের পথ প্রদর্শন করবে। আমরা দেখেছি আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটা বড় দুর্বলতা উচ্চারণ, স্বর ও সংলাপে। বাচিক অভিনয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার্থীদের একটা বড় সমস্যা লক্ষ্য করেছি, এ বিষয়ে শেখার নির্ভরযোগ্য স্থান খুব সীমিত। এ অভাব কিছুটা দূর করার অভিপ্রায়ে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ।

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর ও বাচনরীতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, নিয়মিত চর্চা করেন ও সাফল্যের সাথে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে চলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই বই শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে স্বর ও বাচনরীতি উন্নত করার একমাত্র পথ হচ্ছে চর্চা, আরো চর্চা। সে জন্য গ্রন্থের শেষে কিছু অনুশীলনী দেয়া হয়েছে। বইটির সহায়তা নিয়ে নিয়মিত অনুশীলন করলে যে কেউ স্বর ও সংলাপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারবেন আশা করি।

থিয়েটার স্কুল
১৪৪ নিউ বেইলী রোড
ঢাকা ১০০০

রামেন্দু মজুমদার
২. ৩. ৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথা

অনেকদিন থেকেই 'স্বর ও বাচনরীতি' বিষয়ে একটি বই লেখার তাড়না মনে মনে অনুভব করেছি। ভেবেছিও অনেক, পরিকল্পনাও করেছি। কিন্তু কার্যত আর হয়ে ওঠে নি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, থিয়েটার স্কুল, বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির নাট্য কর্মশালা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাট্য কর্মশালায় কাজ করতে গিয়ে 'স্বর ও বাচনরীতি' বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য নাট্যকর্মীরা এবং প্রশিক্ষণার্থীরা নিরন্তর অনুরোধ জানিয়েছেন। কাজ করতে গিয়ে এটাও মনে হয়েছে, প্রাথমিক স্তরের অভিনেতা বা নাট্যকর্মীদের স্বর সম্পর্কে ধারণা, বাচিক অভিনয়ের মান ও উচ্চারণ আরো উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে কোনো দিক-নির্দেশিকা নেই। স্বর ও বাচনরীতি বিষয়ে তাত্ত্বিক থেকে হাতেকলমে শিক্ষাটাই বেশি জরুরি। সেজন্যেই হাতের কাছে সবসময় একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল থাকা দরকার, যা থেকে নাট্য শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করতে পারেন। সে কথা স্মরণ রেখেই এ-গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছি। স্বর ও বাচনরীতি বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার যা সঞ্চয় এবং বিশ্ববিখ্যাত স্বর ও বাচনরীতি বিশেষজ্ঞ সিসিল বেরি এবং নাট্য প্রশিক্ষক ক্লাইভ বার্কার, রজার ক্রাউচার এবং বিখ্যাত নাট্য নির্দেশক পিটার ব্রুকের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এখানে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও আরো অনেক শ্রদ্ধেয় নাট্য-ব্যক্তিত্বের কাছ থেকেও সময়ে সময়ে নানান পরামর্শ পেয়েছি। সেসব পরামর্শও এখানে কাজে লাগিয়েছি। সর্বোপরি, আমার স্বর্গত পিতৃদেব নাট্যগুণী লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে স্বর ও বাচনরীতি বিষয়ে যে শিক্ষা, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, তা আজও আমি লালন করে চলেছি। এসব কিছুই এই গ্রন্থ রচনায় অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনা হয়তো আরো বিলম্বিত হতো যদি না আমার সহধর্মিনী শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় সারাক্ষণ লেখা শেষ করার জন্যে পীড়াপীড়ি না করতো। এজন্যে তার কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আরো একজন শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্বের কথা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি হলেন রামেন্দু মজুমদার। তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের কারণেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই তাঁর। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

সর্বোপরি, নাট্যকলার ছাত্র, শিক্ষার্থী ও নবীন অভিনেতাদের স্বর ও বাচনরীতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে এই গ্রন্থখানি সহায়িকা হিসেবে কাজে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সকল মহলের সুচিন্তিত মতামত আশা করছি।

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

স্বর-উৎপাদন ও স্বরযন্ত্র পরিচয় ১১
শ্বাস-নিশ্বাস প্রক্রিয়া ২৩
স্বরের নমনীয়তা অর্জনে শরীরের ব্যবহার ৩৬
স্বরের গুণগত মান নির্ধারণের উপাদান ৪৫
বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ পদ্ধতি ৫৭
বাচনের উপাদান ও বলার প্রক্রিয়া ৭৩
রস-ভাব-আবেগ ৯০
নাট্য সংলাপ বলার কৌশল ১০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর উৎপাদন ও স্বরযন্ত্র পরিচয়

মানব সমাজের ইতিহাসে প্রথম যুগ ছিল বন্যস্তর বা বন্যযুগ (Savagery)। এই সময়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি, আচরণ ও পশু-পাখির শব্দ অনুকরণের মাধ্যমে যোগাযোগ করতো। এই বন্যস্তর পার হয়ে যেদিন মানুষ আদিম-প্রস্তরযুগে এসে হাজির হলো, শিখলো আগুন জ্বালাতে, আগুনে পুড়িয়ে খাবার খেতে শিখলো, তীর-ধনুক ও চামড়ার ব্যবহার শুরু করলো, সেই সময় থেকেই শুরু হলো কথার ভাষা (Articulate Language)। সেই থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন প্রস্তর-যুগে এসে হাজির হয়। মানুষের সভ্য হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মানুষ তখন গ্রাম্য-সমাজ গড়েছে, সঞ্চয় করা শিখছে। ইট-পাথর দিয়ে ঘরদোর তৈরি করা, বাসনপত্র তৈরি, রান্না করা, কাপড় বোনা, অলঙ্কার বানানো, নানা ধরনের অস্ত্র ও লোহার ব্যবহার এবং লেখার জন্য বর্ণমালার প্রচলন এই যুগে সম্ভব হয়। অবশ্য বর্ণমালা একদিনে গড়ে ওঠে নি। নানা কর্মপ্রেরণা, নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে, স্থান, কাল ও নানা প্রকারের সংকেতের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে এগুলো আলোকিত হয়ে ওঠায় একটা বোধগম্য রূপ পেল বর্ণমালা। মানুষের সভ্যতার পরের স্তরগুলোতে যতই মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে, ততই তার ভাষা হয়েছে বলিষ্ঠ, তার চিন্তা হয়েছে সূক্ষ্ম। মানুষের মনে ভয়, ক্রোধ, আনন্দ ছাড়াও স্নেহ-মমতা-করুণা প্রভৃতি নানা অনুভূতি, বহু বিষয়ে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রেরণায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে সহজেই বোঝা যায় মানুষের এই বিভাগের অগ্রগতি কিভাবে সম্ভব হলো। মানুষের এই বাক্‌সমৃদ্ধির উৎস কোথায়? ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতির জন্য জীবদের মধ্যে একমাত্র মানুষ বাগ্‌ভাষার অধিকারী। মানুষের ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের গঠন অনেক উন্নত। ইতর প্রাণীর ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্ক-আবরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Cerebral Cortex) গঠন অপরিণত। মানুষের পরিণত। তার সমন্বয় স্থান (association Area) অনেক বিস্তৃত। তাইতো মানুষ তার শ্রবণস্থান দিয়ে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। কোনটা সমুদ্রের শব্দ, কোনটা পশু-পাখির শব্দ আর কোন্‌টাই-বা বজ্রবৃষ্টির শব্দ সবই মানুষ বুঝতে পারে। আর দৃষ্টিস্থান থেকে বিভিন্ন জিনিস দেখে তাদের দৃশ্যন্তরের কত না তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসের পার্থক্য ধরতে পারে। মানুষ সব কিছু বোঝে, তার অর্থ করে এবং ব্যাখ্যা করে

চিত্র : ১

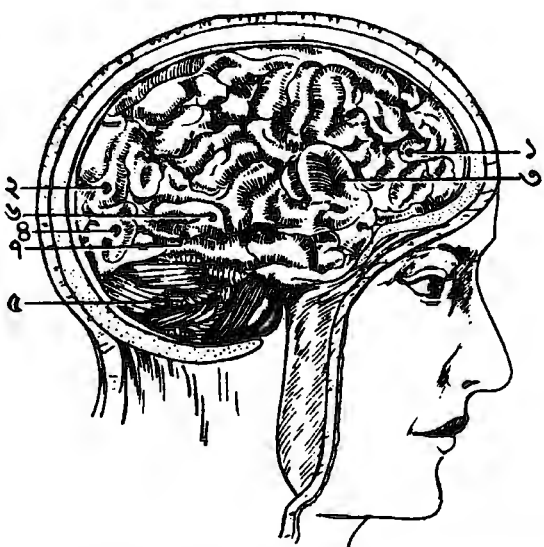

১ - সম্মুখের অনুষঙ্গ ক্ষেত্র **(Frontal association area)**--যুক্তি ও বিচার শক্তির কেন্দ্র **(Power of reasoning)**
২ - দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর ব্যাখ্যা কেন্দ্র **(Interpretation of visual symbols)**
৩ - বাকশক্তির কেন্দ্র **(Production of articulate speech)**
৪ - দৃষ্টির অনুভূতির কেন্দ্র **(Visual sensory area)**
৫ - ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক **(Cerebellum)** শ্রবণ- দর্শন- বাক্ সমন্বয় কেন্দ্র **(Coordination & motor speech activity)**
৬ - ধ্বনি গ্রহণ কেন্দ্র **(Sound reception area)**
৭ - ধ্বনির ব্যাখ্যা কেন্দ্র **(Auditory interpretation)**

মস্তিষ্কের গঠন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তিষ্কের সংযোগমূলক অংশের (Frontal Association Area) সাহায্যে। এই মস্তিষ্কের সংযোগমূলক অংশের বিস্তার এবং দৃষ্টিকেন্দ্র (Vision Area), শ্রবণ কেন্দ্র (Sound area) এবং বাক্ প্রচেষ্টা কেন্দ্রের (Speech movement area) শক্তির জন্য মানুষ বাগ্‌ভাষা প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে। এই বাগ্‌ভাষার জন্য ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum) উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে শ্রবণ, দর্শন ও বাক্‌প্রচেষ্টার যথারীতি সমন্বয় (Co-ordination) করে দেয় বলে বাক্‌সৃষ্টি সম্ভব হয়।

মানুষের উর্ধ্বতন মস্তিষ্কাবরণ (Cerebral Cortex) বিশেষভাবে বাক্‌শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে আছে দশ হাজার কোটিরও বেশি স্নায়ুকোষ। এদের গতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষ দেখতে, শুনতে, বলতে ও লিখতে পারে।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এক ধরনের গতিময় প্রেরণা (Impulse) গ্রহণ করে। মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট বিভিন্ন অংশ ঐ প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে বোধগম্য করে তুলে (Interpret) অর্থপূর্ণ রূপ, ধ্বনি বা কথায় রূপান্তরিত করে। আর এই কারণেই মানুষ কোনো বস্তুকে চিনতে পারে, কোনো ধ্বনি শুনতে পায়, কোনো চিহ্ন বা বর্ণ পড়তে পারে এবং ধ্বনি ও শব্দের অর্থ গ্রহণ করতে পারে। মুখগহ্বর, জিহ্বা, দন্ত, মাড়ি, ওষ্ঠ, তালু, মূর্ধা আলজিহ্বা, গলবিল, নাকের পাশের গহ্বর-নালি, মুখ ও চোয়ালের পেশি, ল্যারিংক্স ও ফেরিংক্স-এর পেশি (Laryngial and pharyngeal muscles), সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla), ফ্রেনিকস্নায়ু, মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) প্রভৃতি কথা বলায় সাহায্য করে থাকে। এছাড়া সুষুম্না কাণ্ড (Spinal cord) থেকে বেরিয়ে আসা যে স্নায়ুগুলি বাক্‌ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত পেশি নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও বাক্‌শক্তির সহায়ক। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের (Cerebellum) হাতে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক যেমন কথা বলাতেও পারে, তেমনি কথা গোপন করাতেও পারে। এই কেন্দ্রের ক্ষতি হলে মানুষ ঠিকভাবে কথা বলতে পারে না। পক্ষাঘাত হলে মানুষের কথা বলার শক্তি কমে যায়। কারণ পক্ষাঘাতে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কই আক্রান্ত হয়।

স্বর উৎপাদন

কথা বলতে গেলেই আমরা স্বর প্রয়োগ করে থাকি। নিজ কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ গঠন ও প্রকৃতি এবং তার নানা রূপান্তর নিজ বাক্‌যন্ত্রের কার্যপ্রণালির ভিত্তিতে বুঝে নিতে হয়। স্বরযন্ত্রে উৎপন্ন স্বর কণ্ঠ, নাসাগহ্বর ও মুখের বিভিন্ন অংশে নানাভাবে বাধা পেয়ে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি করে। আমরা জীবনধারণের কারণে যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি সেই প্রক্রিয়ারই একটা অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসেবে আমরা স্বর বা বাক্ উৎপাদনের ক্ষমতা পেয়ে গেছি। তাহলে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি স্বরসৃষ্টির

জন্য বিশেষ তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো : ক. স্বরতন্ত্রীর (Vocal cord) কম্পন খ. স্বরতন্ত্রী কাঁপানোর জন্য শ্বাস-নিশ্বাসের শক্তি এবং গ. ঐ কম্পন-উদ্ভূত স্বর বহন করে আনার মাধ্যমস্বরূপ নিশ্বাসজাত হাওয়া। এছাড়াও ফুসফুস (Lungs), শ্বাসনালি (Trachea), স্বরযন্ত্র (Larynx), গলবিল (Pharynx), ফ্রেনিক স্নায়ু, ডায়াফ্রাম প্রভৃতি। তাই আমাদের ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার স্বর উৎপাদনে এদের ভূমিকা কি।

ফুসফুস (Lungs) : আমাদের ফুসফুস অনেকটা স্পঞ্জের মতো এবং মোচার আকৃতির বেলুনের মতো। এটি অনেকটা সংকোচন ও প্রসারণযোগ্য পাম্পের মতো। এটি রয়েছে আমাদের বুকের গহ্বরের মধ্যে। নাক আর গলার সঙ্গে সংযুক্ত শ্বাসনালি নেমে এসে দু'ভাগ হয়ে ঢুকে গেছে দুই ফুসফুসের মধ্যে। শ্বাস নিলে

চিত্র : ২

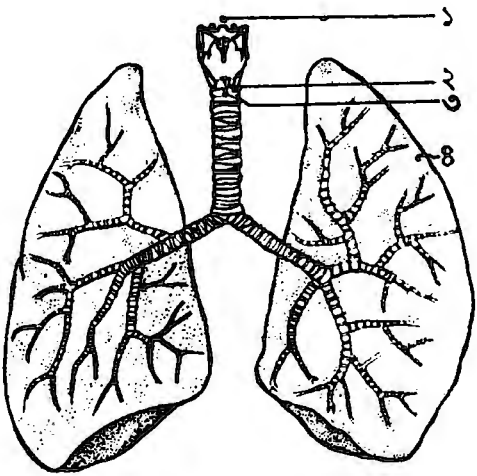

১ - জিহবা মূল
২ - ক্রিকয়েড কোমলাস্থি
৩ - শ্বাস নালী
৪ - ফুসফুস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুসফুস দুটো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে, আর সেই সাথে সাথে বুকের পাজরও ফুলে ওঠে। আর যেই শ্বাস বেরিয়ে যায়, ফুসফুসও চুপসে যায় এবং সেই সাথে বুকের পাঁজরও নেমে আসে। ফুসফুসের বাতাস ধরে রাখবার শক্তির ওপর নির্ভর করে কথা বলার বা স্বর উৎপাদনের জন্য স্বরতন্ত্রীতে কম্পন সৃষ্টি করা। যিনি যত বেশি বাতাস ধরে রাখতে পারেন, তিনি তত বেশিক্ষণ একদমে বলতে পারবেন।

বক্ষগহ্বর (Thorax) : বুকের কঙ্কালের মাঝখানে যে ফাঁকটা থাকে তাকেই বলি বক্ষগহ্বর। শিরদাঁড়া, কাঁধের হাড়, বুক ও পাঁজরের হাড়ের ফাঁকা অংশটুকুই এই এলাকা। এখানে থাকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও উদর। একটা পাতলা পর্দা বা ডায়াফ্রাম দিয়ে উদর আর বক্ষগহ্বর ভাগ করা থাকে।

শ্বাসনালী (Trachea) : মুখগহ্বরের তলা থেকে নয়খানি কোমলাস্থি (Cartilage) নিয়ে লম্বা গোল নলের মতো নেমে এসেছে এই শ্বাসনালি। কিছুদূর গিয়ে ভাগ হয়ে ঢুকেছে দুই ফুসফুসে। যে কোমলাস্থি দিয়ে শ্বাসনালি তৈরি, তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে কতগুলো টিসু, যেগুলো খানিকটা পেশির মতো কাজ করে। নাসারন্ধ্র আর শ্বাসনালির মাঝে আছে স্বরযন্ত্র বা Larynx, ছোট্ট যন্ত্র। শ্বাসনালির সঙ্গেই নিশ্বাস ছাড়বার এবং শ্বাসগ্রহণ করবার নালি যুক্ত থাকে। ফুসফুস এবং স্বরযন্ত্র মধ্যবর্তী পথে যে বায়ুনালী রয়েছে তার দৈর্ঘ্য পুরুষের বেলায় ১২ সে.মি. এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০ সে.মি.

গলবিল (Pharynx) : গলবিল দিয়েই নাক থেকে স্বরযন্ত্র সংযুক্ত রয়েছে। গলবিলের মুখে আলজিহ্বা রয়েছে। শব্দ সৃষ্টি হলে গলবিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আলজিহ্বা আটকে উত্তেজনা কমানো যায় এবং খুলে বাড়ানো যায়। আর এর ফলেই স্বরের পরিবর্তন ঘটে।

মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) : এটি বক্ষগহ্বর ও উদরের মাঝামাঝি সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলা দেখাবার নেটের মতো টানানো একরকমের পেশিজাত পর্দা। এ যেন ফুসফুসকে বেড়ে ওঠা উদরের অন্ত্র-পাকস্থলী ইত্যাদিকে চাপ দিতে দিচ্ছে না। আবার প্রয়োজনে খানিকটা চেপে বাড়তেও দিচ্ছে। মধ্যচ্ছদীয় স্নায়ুর সহায়তায় এটি শ্বাস-নিশ্বাস ক্রিয়ার প্রয়োজনে ওঠানামা করতে পারে। মোট কথা ফুসফুসে আমরা যত খুশি বাতাস ঠেলে ভরে দিতে পারি না শুধু মধ্যচ্ছদার জন্য। ডায়াফ্রাম একধরনের পিছল শ্লেষ্মা-ঝিল্লি দ্বারা (mucus membrane) আবৃত।

মধ্যচ্ছদীয় স্নায়ু (Phrenic Nerve) : এটি রবারের মতো কমতে ও বাড়তে পারে, এমন একটি স্নায়ু। এটি গলার কাছে সুষুম্না কাণ্ড (Spinal Cord) থেকে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এটি সঙ্কোচন-সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে ডায়াফ্রামকে ওঠানামা করতে সাহায্য করে। ফুসফুসে বেশি চাপ দিলে এই স্নায়ু মধ্যচ্ছদাকে টেনে

রেখে ফুসফুসের বৃদ্ধিকে সংযত করে। আবার শ্বাস ছেড়ে দিলে সহজ হয়ে আসে।

সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla) : অনেকগুলো অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত সুষুম্নাশীর্ষে। মেরুদণ্ডের উর্ধ্বভাগে মেডুলা বা সুষুম্নাশীর্ষ অবস্থিত। এটি প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনি উৎপন্ন করে না। সুষুম্না দুর্বল হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়।

সুষুম্না কাণ্ড (Spinal cord) মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকে সুষুম্না কাণ্ড এবং তার পেশিগুলি নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এতক্ষণ আমরা কতগুলি সহযোগী যন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো স্বর উৎপাদনে সহায়তা করে। এবার স্বর উৎপাদনের জন্য সরাসরি যে যন্ত্রটি দায়ী, সেই স্বরযন্ত্র বা Larynx বা vocal Box সম্পর্কে আলোচনা করবো।

স্বরযন্ত্র (Larynx) : শ্বাসনালির মাথা ত্রিকোণ ফানেলের মতো আকার ধারণ করে এর সৃষ্টি করেছে। উর্ধ্বমস্তিষ্কের মতো এটিও মানুষের ক্ষেত্রে অতিপুষ্ট ও

চিত্র : ৩

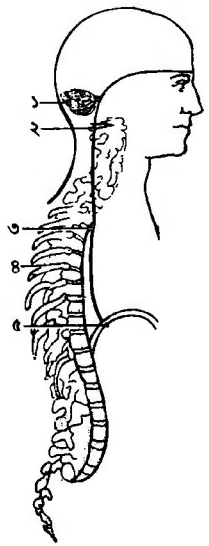

১ - ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum)
২ - সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla)
৩ - মধ্যচ্ছদীয় স্নায়ু (Phrenic nerve)
৪ - মেরুদন্ড (Spine), এর মধ্যে সুষুম্নাকান্ড(Spinal cord) থাকে
৫ - মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত। একারণেই মানুষের কণ্ঠস্বরে এত বৈচিত্র্য। অন্য কোনো প্রাণীর স্বরযন্ত্র এত পুষ্ট ও পরিণত নয়, আর সে কারণেই এটিকে ভালো করে জানা ও বোঝা দরকার। স্বরযন্ত্রের পাঁচটি অংশ :

ক. শ্বাসরন্ধ্রের ঢাকনা (Epiglottis) : স্বরযন্ত্রে যাতে শ্বাস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য ঢুকতে না পারে, তারই প্রতিবন্ধক হিসেবে এটি স্বরযন্ত্রের মুখে ঢাকনার কাজ করে। এটি অনেকটা স্প্রিং-এর মতো বাড়তে-কমতে পারে। কিছু গেলার সময় এটি বেড়ে গিয়ে স্বরতন্ত্রীর মুখ আটকে দেয়। গেলা হয়ে গেলে অর্থাৎ খাদ্যনালি দিয়ে খাবারটা পাকস্থলীতে যাওয়ার পর আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

খ. থাইরয়েড কার্টিলেজ (Thyroid cartilage) :এদের সংখ্যা দুটি। ক্রিকয়েড কার্টিলেজের উপরের অংশে স্বরযন্ত্রের দু'দিকে দুটির অবস্থান। এরা স্বরযন্ত্রের ভেতরের নরম অংশের রক্ষাকবচরূপে কাজ করে এবং স্বরযন্ত্রের সন্ধিবন্ধনী (ligaments) ও কতকগুলি পেশির অবস্থানের সহায়তা করে। থাইরয়েড দুটির জন্যই স্বরযন্ত্রের সন্ধিবন্ধনীর ও পেশিসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ সম্ভব হয়। এ দুটির সামগ্রিক আকার অনেকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো। এদের শিল্ড কার্টিলেজ বা Adams apple বলা হয়ে থাকে।

গ. এরিটিনয়েড কার্টিলেজ (arytenoid cartilage) : এদের সংখ্যা দুটি। কতকটা পিরামিডের মতো দেখতে। এরা ক্রিকয়েড কার্টিলেজের ওপরে স্বরযন্ত্রের দু'দিকে থাকে। এ দুটিও স্বরযন্ত্রের কতকগুলো পেশির অবস্থানের সহায়তা করে।

এরা পিছনে ও পাশে নড়াচড়া করতে পারে। এই গতির জন্যই ইংরেজি 'V' বর্ণের আকৃতির স্বরতন্ত্রী প্রয়োজনে কাছাকাছি আসতে পারে, আবার দূরে সরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

ঘ. ক্রিকয়েড কার্টিলেজ (Cricoid Cartilage) :শ্বাসনালি ও স্বরযন্ত্রের মধ্যে এর অবস্থান।

ঙ. স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) :এদের সংখ্যা দুটি, থাইরয়েড কার্টিলেজের পিছনের দিক থেকে উঠে এরা এরিটিনয়েড কার্টিলেজের সঙ্গে মিশে ইংরেজি 'V' বর্ণের উলটো আকার ধারণ করেছে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী প্রায় ১ ইঞ্চি (.৮৭৫ ইঞ্চি) থেকে ১.২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। নারীর স্বরতন্ত্রী .৫ ইঞ্চির একটু কম থেকে প্রায় ১ ইঞ্চি (.৮৭৫ ইঞ্চি) পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী মেয়েদের স্বরতন্ত্রী থেকে একটু বেশি পুরু। এইজন্য মেয়েদের চেয়ে পুরুষের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা মোটা হয়। পুরুষের স্বরতন্ত্রীর রঙ কিছুটা হলুদ বর্ণের ও মেয়েদের স্বরতন্ত্রী সাদাটে রঙের। নরম স্বরতন্ত্রী দুটি পিছল শ্লেষ্মা-

চিত্র : ৪

ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র

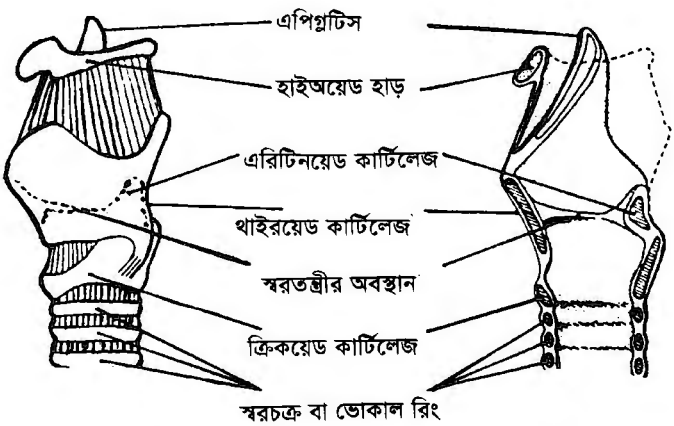

ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের পার্শ্বদৃশ্য

ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের কর্তিত দৃশ্য

ঝিল্লিদ্বারা আবৃত থাকে।

দুটি স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাঁককে গ্লটিস (Glottis) বলে। বাতাস যাওয়ার সময় গ্লটিসের গুণের ওপর ধ্বনির রকম নির্ভর করে। বাতাস বের হওয়ার সময় স্বরতন্ত্রী যদি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তবে সৃষ্ট হয় ঘোষধ্বনি, তেমন প্রভাবিত না হলে হয় অঘোষধ্বনি।

খাদ্যনালি বরাবর মুখগহ্বরের ভিতরের দিকে উঠে গেলে, নাসিকা গহ্বরে যাওয়ার একটা পথ পাওয়া যায়। একটা গর্ত। সেই গর্তটিকে পেরিয়ে মুখগহ্বরের সামনের দিকে এগুলে প্রথমেই পাওয়া যায় কোমল তালু (Soft Palate)। এই নরম অংশটি উঠে নেমে নাসিকা গহ্বরের পথ খোলা বা বন্ধ রাখতে পারে। তার ফলে,

চিত্র : ৫

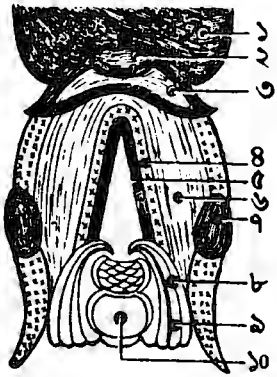

১-জিহ্বার মূল ২-শ্বাসরন্ধ্রের ঢাকনার গদি ৩-শ্বাসরন্ধ্রের ঢাকনা
৪-কৃত্রিম স্বরতন্ত্রী ৫-স্বরতন্ত্রী ৬-স্বরযন্ত্রের পেশি
৭-থাইরয়েড কোমলাস্থি ৮-এরিটিনয়েড কোমলাস্থি ৯-স্বরযন্ত্রের পেশি
১০-ক্রিকয়েড কোমলাস্থি

(উলটো 'V' আকৃতির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা শ্বাস-নিশ্বাস যাতায়াতের পথ)

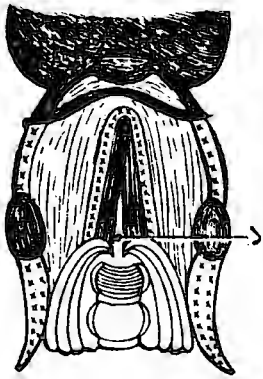

১-সরু শ্বাসরন্ধ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনমতো আমরা নাসিকা গহ্বর ব্যবহার করতে বা না করতেও পারি। কোমল তালুর সামনের অংশ কঠিন তালু (hard palate)। একে মূর্ধাও বলে। এটি গিয়ে মিশেছে ওপরের সারির দন্তমূল (alveolum বা teeth-ridge)-এ, তারপর দন্ত, তারপর ওষ্ঠ।

শ্বাসারন্ধ্রের ঢাকনা (Epiglottis) বা অধিনালিকা যেখানে শেষ, জিহ্বা

চিত্র ৬

গ্লটিস বা সরু শ্বাসরন্ধ্র

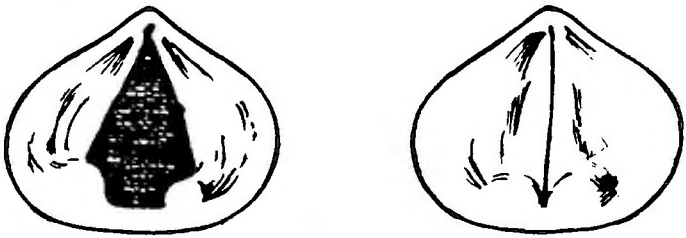

গ্লটিস বা সরু শ্বাসরন্ধ্রের ছবি বড় করে দেখানো হয়েছে। গ্লটিস বা সরু শ্বাসরন্ধ্র স্বরতন্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে থাকলে শ্বাসগ্রহণ হয় এবং বন্ধ থাকলে বাধা পেয়ে শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

(tongue)-র সেখানে শুরু। জিহ্বার অপর প্রান্ত ছুঁতে পারে নিচের সারির দন্তমূল। তারপর অধর।

খাদ্যনালির দিকে নেমে গেছে যে পথ, স্বরযন্ত্রের পেছন দিকে যার অবস্থান, ওই অংশ থেকে কোমলতালুর মুখ পর্যন্ত সমস্ত অংশটাকে বলা হয় ফেরিংস। নাসিকাগহ্বরে ঢোকার পথটির প্রথমাংশ পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে ফেরিংস। অনুনাদ সৃষ্টির (Resonance বা Vibration) জন্য এই ফেরিংস-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে ট্র্যাকিয়া, ব্রংকাই, লাংস ও নাসিকাগহ্বর বা মুখগহ্বরের বা সামনের অংশ এই কাজে অংশ নেয়। কোমলতালু যেখানে শেষ হয়েছে তার নাম আলজিহ্বা। এই অংশগুলো প্রত্যেকটিই উচ্চারণের শুদ্ধতার জন্য প্রয়োজনে লাগে। তাই এগুলো চেনা দরকার।

শ্বাস-নিশ্বাস গমনাগমনের জন্য উলটো 'V' আকৃতির স্বরতন্ত্রীর (lips of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র : ৭

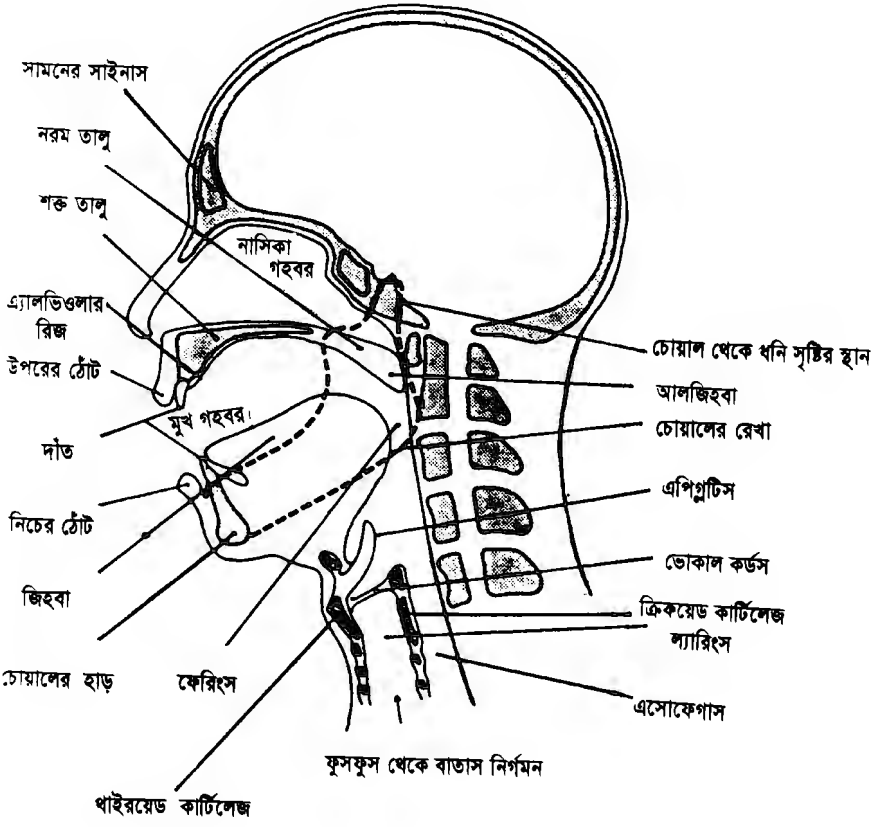

বাচনের যন্ত্র সমূহ

~ www.amarboi.com ~

epiglottis) মধ্যে অনেকটা ফাঁক (aperture of glottis) থাকে। কিন্তু শ্বাস গ্রহণের পরে স্বরসৃষ্টির বাসনা হলে স্বর-সম্পৃক্ত পেশী ও কার্টিলেজের উত্তেজনাজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বরতন্ত্রীদ্বয় একেবারে কাছাকাছি এসে প্রায় সরলরেখার মতো খুব ছোট একটি ফাঁক তৈরি করে। এটাকে সরু শ্বাসরন্ধ্র বা (glottis) বলে। নির্গমনমুখী শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে আসে ব্রংকাই-তে। তারপর ট্র্যাকিয়া পার হয়ে যখন ল্যারিংস-এর মধ্যে প্রবেশ করে, সে সময় স্বরতন্ত্রী দুটি যদি এগিয়ে এসে পথ বা গ্লটিস-এর আকার পরিবর্তন ক'রে পথরোধের চেষ্টা না করে, তবে সে বাতাস নাক বা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। কোনোরকম স্বরোৎপাদন হয় না। যদি স্বরতন্ত্রী পথ অবরোধ করে, তবে নিশ্বাস বায়ুর ধাক্কায় স্বরতন্ত্রী কাঁপতে থাকে। এই বারবার বাধাজনিত কম্পনের জন্যই স্বর উৎপন্ন হয়। প্রতি সেকেন্ডে এই কম্পনের সংখ্যা নির্ভর করে স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য, স্থূলত্ব এবং উত্তেজনার (degree of tension) ওপর। সাধারণ পরিণত পুরুষের স্বরতন্ত্রীর কম্পনের পৌনঃপুনিকতা প্রতি সেকেন্ডে ১২৮ তরঙ্গ (Waves per second) এবং একজন পরিণত মেয়ের প্রতি সেকেন্ডে ২৫৬ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। কম্পন তরঙ্গ বেশি হলে স্বর পাতলা হবে এবং বেশি হলে কণ্ঠস্বর মোটা হবে। তাই মেয়েদের স্বর স্বভাবতই পাতলা ও একটু উঁচু এবং পুরুষের স্বর মেয়েদের স্বরের তুলনায় গম্ভীর ও খাদের।

Crico-thyroid পেশি, thyro-arytenoid পেশি প্রভৃতি স্বরতন্ত্রী সম্পৃক্ত পেশিসমূহের (Vocal muscles) উত্তেজনাই স্বরতন্ত্রীকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। Crico-Thyroid পেশি ও thyro-arytenoid পেশির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বরতন্ত্রী সঙ্কুচিত হলে উঁচু পর্দার স্বর (high pitch) এবং দীর্ঘায়িত হলে নিচু পর্দার সুর উৎপন্ন হবে। স্বরযন্ত্রের সমস্ত পেশি উত্তেজিত হয়ে কোনো-না-কোনোভাবে স্বরসৃষ্টিতে সাহায্য করে। স্বরতন্ত্রী দুটি নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ পেশিগুলোর জন্যই। ঐ পেশিগুলোর কারণে স্বরতন্ত্রী দুটি দীর্ঘ হয়, কখনো হ্রস্ব, আবার কখনো উপরে ঠেলে তোলে, কখনো নিচে টেনে নামায়। এদের জন্যেই তন্ত্রী দুটি একসাথে মিশতে পারে। আবার আলাদা হয়ে দূরে সরে যেতে পারে। এ কারণে স্বরের বিভিন্নতা-উদারা, মুদারা ও তারা স্বর সৃষ্টি হয়। উদারার স্বরে সমগ্র স্বরতন্ত্রী, মুদারার স্বরে স্বরতন্ত্রীর প্রান্তভাগ এবং তারার স্বরে স্বরতন্ত্রীর কেবল ঊর্ধ্ব অংশের প্রান্তভাগে কম্পন সৃষ্টি হয়। এই কম্পনের হারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অনুনাদের জন্য গহ্বরগুলো ব্যবহার করতে হয়। তবেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্টতর কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়। সেরূপ স্পষ্টতর ধ্বনি বা স্বরের জন্য গলায় কোনো বাড়তি চাপ দেয়ার দরকার করে না।

শ্বাস-নিশ্বাস প্রক্রিয়া

শ্বাস-নিশ্বাস

নাক দিয়ে বাতাস গ্রহণ করে তাকে ফুসফুসে নিয়ে যাওয়াকে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বলা হয়ে থাকে। আর যে বাতাস আমরা ফুসফুস থেকে গলনালি হয়ে

চিত্র ৮

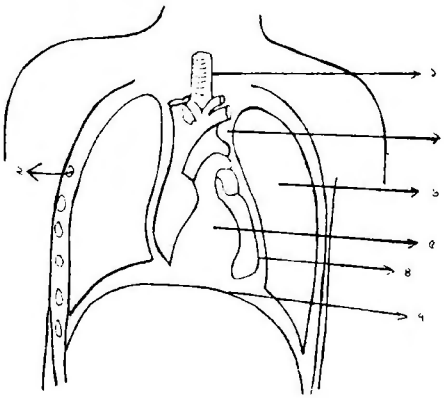

১ ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি
২ পার্জরের কর্তিত অংশ
৩ প্লুরার বর্হিভাগ
৪ পেরিকার্ডিয়ামের বহিভাগ
৫ হৃৎপিণ্ড
৬ ফুসফুস
৭ ডায়াফ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র : ৯

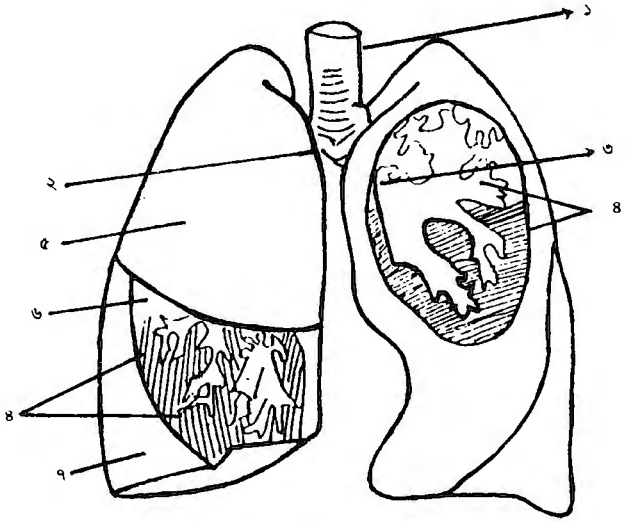

শ্বাস যন্ত্র

১ - ট্র্যাকিয়া বা শ্বাসনালি
২ - ডান
৩ - বাম ব্রংকাস্
৪ - ব্রংকিওলস্
৫ - ফুসফুসের উপরিভাগ
৬ - ফুসফুসের মাঝখানের ভাগ
৭ ফুসফুসের নিচের ভাগ

নাসিকাগহ্বর থেকে বাইরে ছেড়ে দিই তাকে নিশ্বাস বলা হয়। যে শ্বাস আমর ত্যাগ করছি অর্থাৎ নিশ্বাস, তাই আমাদের বাক্‌শক্তির উৎস। কিন্তু এই নিশ্বাস নির্ভর করে প্রশ্বাস বা শ্বাসের ওপর। প্রশ্বাসই নিশ্বাস বায়ুর যোগানদার। আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে শুয়ে-বসে থাকি তখন শ্বাস-নিশ্বাস সমানগতিতেই বুকের গহ্বরে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু সামান্য খাটাখাটনি করলেই শ্বাস-নিশ্বাস ক্রমান্বয়ে দ্রুত হয়। বাক্‌যন্ত্র ব্যবহারকালে শ্বাসের তুলনায় নিশ্বাস দ্রুত হয়। অর্থাৎ যে পরিমাণে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি তার চেয়ে দ্রুত তা ফুরিয়ে যায়। ভালো স্বরোৎপাদনের জন্য ঠিক এর বিপরীত অভ্যাস প্রয়োজন। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন নিশ্বাস বায়ু এ কাজে অপরিহার্য, তাই 'দ্রুত শ্বাস গ্রহণ ও যথাসম্ভব ধীরে শ্বাস ত্যাগ'—এই হলো স্বরোৎপাদন ক্ষেত্রে শ্বাস নিয়ন্ত্রণের মূল সূত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র ১০

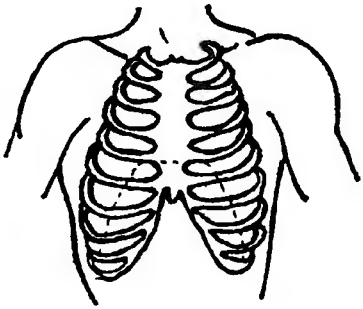

ডায়াফ্রাম

চিত্র ১১

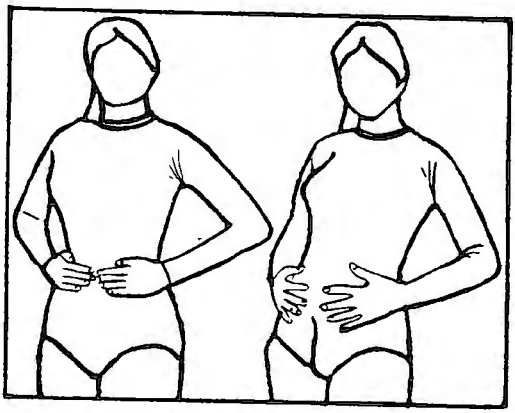

ডায়াফ্রাম ব্রিদিং

শ্বাস-নিশ্বাসের প্রকার

প্রকারভেদে শ্বাস তিন রকমের। ক. প্রবাহমূলক (tidal) : সাধারণভাবে সবসময় নাক দিয়ে যে শ্বাস গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া চলে থাকে তাকেই প্রবাহমূলক শ্বাস বলা হয়। খ. অবশিষ্ট (residual) : নিশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার পরেও দুই ফুসফুসের মাঝে কিছু বাতাস অবশিষ্ট থাকে, তাকেই অবশিষ্ট বা রেসিডুয়াল শ্বাস বলে। গ. অনুপূরক (supplemental) : বিশেষ বিশেষ কাজে বেশি নিশ্বাস দরকার হলে ফুসফুস বাড়তি শ্বাস টেনে নেয়। একে অনুপূরক শ্বাস বলে। গায়ক, বক্তা, অভিনেতা বা শ্রমজীবী মানুষকে অনুপূরক শ্বাস গ্রহণ করতেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বাসের নানা রীতি

আমাদের শ্বাসগ্রহণ তিনটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

ক. উদররীতি (Abdominal method) : স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুস প্রশ্বাসে বেড়ে ওঠে। ঐ বেড়ে ওঠার ফলে উদর গহ্বরের নানা স্থানে চাপ পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পেটটা ফুলে ওঠে। নিশ্বাস ছেড়ে দিলে পেট আবার নেমে যায়। এভাবে শ্বাস নিলে বুক এবং পাঁজরের নিচের দিকটা সামান্য বাড়লেও পেট ফুলেই বেশি বাতাসের জায়গা করে দেয়। এর ফলে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ সহজ হয়। মানুষ এই সহজ স্বাভাবিক রীতির শ্বাস গ্রহণ করে বলে একে স্বাভাবিক রীতিও বলা হয়। আবার এতে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম অধিক ক্রিয়াশীল হওয়ায় একে ডায়াফ্রাম ব্রিদিংও বলা হয়ে থাকে। এই রীতিতে শ্বাস গ্রহণের সময় অপেক্ষা নিশ্বাস নির্গমনের সময় বেশি হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে নিশ্বাসকে ধরে রেখে একটু একটু করে ছেড়ে কথা বলতে হয়। এই রীতিতে বক্তার কণ্ঠস্বর ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। গায়ক বক্তা ও অভিনেতাদের এ রীতিতে শ্বাসগ্রহণ করায় অভ্যস্ত হতে হয়।

চিত্র ১২

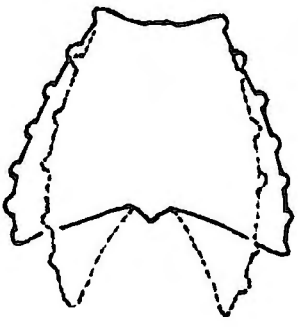

শ্বাস-নিশ্বাস কালে বুকের পাঁজরের ওঠানামা

চিত্রে ভরাট লাইনে বুকের পাঁজর শ্বাস গ্রহণকালে ফুলে উঠেছে: এবং শ্বাস ছাড়ার পর ভাঙ্গা বা ডট লাইনে পাঁজর সংকুচিত হয়েছে

চিত্র ১৩

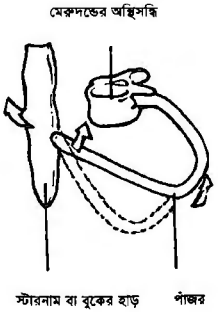

শ্বাস-নিশ্বাসকালে পাঁজর কিভাবে আন্দোলিত হয় চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

খ. বক্ষপঞ্জরে শ্বাসগ্রহণ বা পঞ্জরাস্থি সংক্রান্ত রীতি (Costal method বা Rib breathing) : এ পদ্ধতিতে শ্বাসগ্রহণ করার সময় পাঁজর বিস্তৃত হয়ে ফুসফুসকে অনেক জায়গা করে দিতে পারে। এই রীতিতে বেশি পরিমাণ শ্বাস গ্রহণ সম্ভব। এর সঙ্গে উদররীতির কিছুটা যোগ থাকলেও বক্ষগহ্বরের পেশি ও পাঁজর অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে দু'পাশে বিস্তার লাভ করে। তাই একে পার্শ্বিক রীতিও বলা হয়। গান বা অভিনয়ের সময় যখন উদররীতিতে শ্বাসগ্রহণ যথেষ্ট সহায়ক হয় না, তখনই এই রীতিতে শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। এই রীতিতে কখনো ধীরে, কখনো জোরে শ্বাস নিয়ে প্রয়োজনীয় স্বর সৃষ্টি করতে হয়। ঠিকমত শ্বাস না নিলে চরিত্রের বিভিন্নতা ও ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্বর উৎপাদন এবং নানারকম স্বরভঙ্গি (modulation) সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব।

চিত্র ১৪

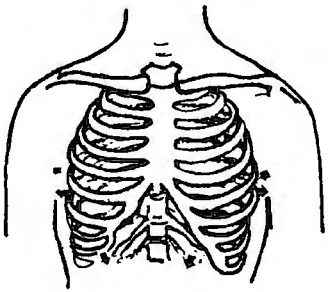

ডায়াফ্রাম

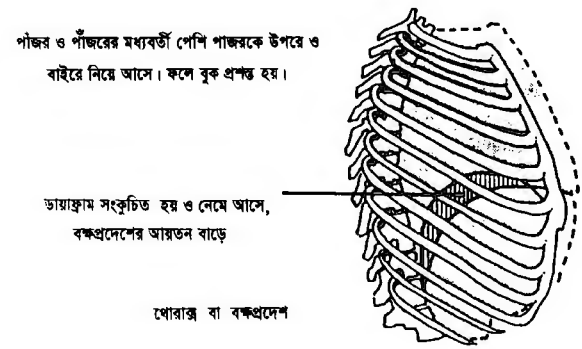

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র - ১৫

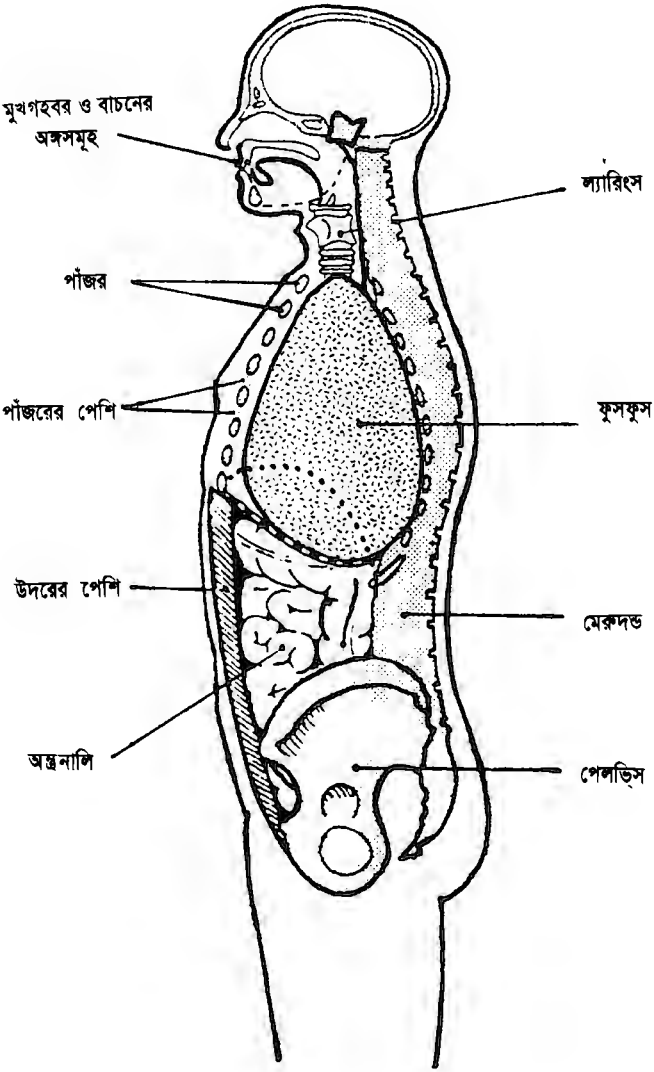

টর্সো থেকে স্বরের অঞ্চল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র ১৬

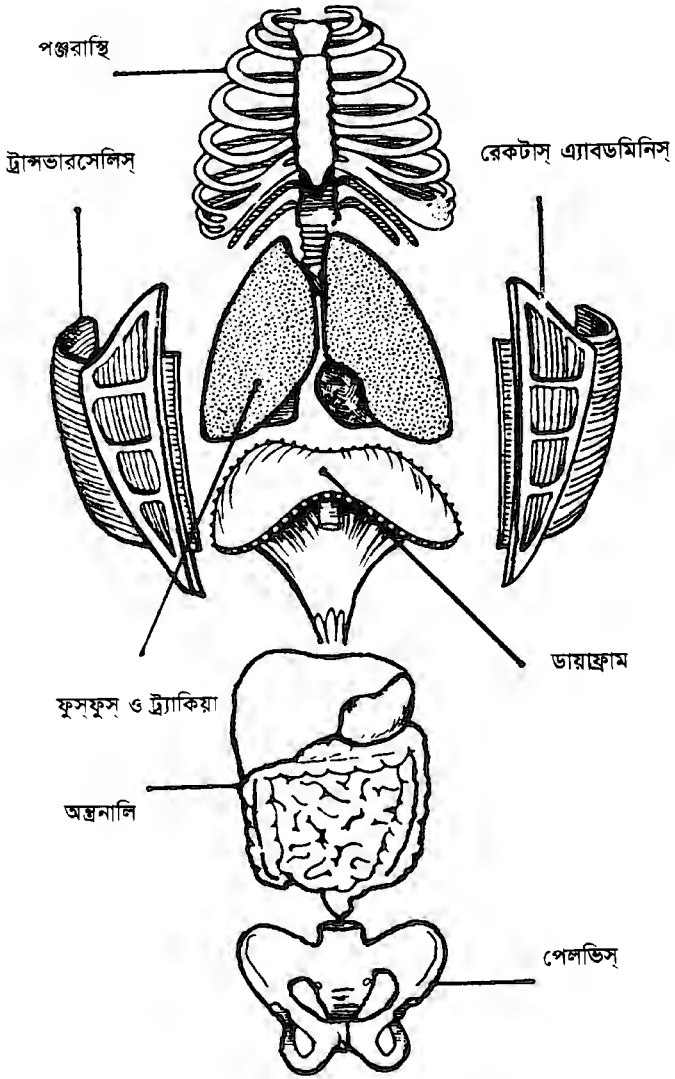

পাঁজর, ফুস্‌ফুস্, ডায়াফ্রাম, উদরের পেশির
আলাদা আলাদা ভাবে সম্মুখ ভাগের দৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র ১৭

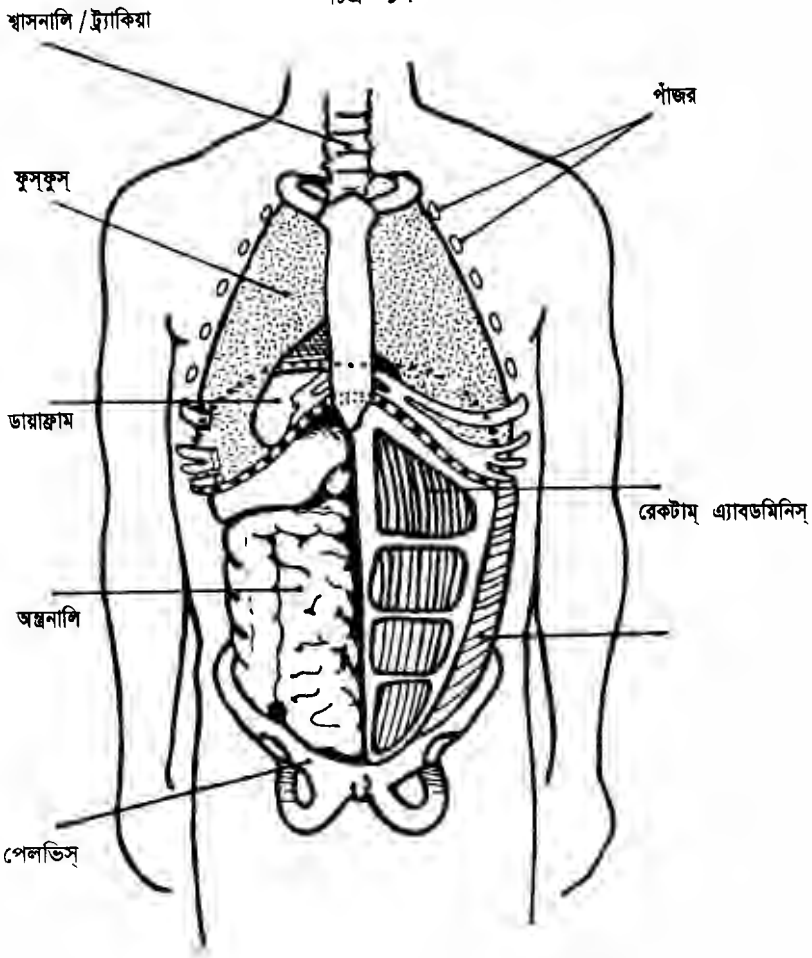

ডায়াফ্রাম ও নিচের পাজঁরের খাঁচার সংযোগ স্থল

এই লাইন দিয়ে ডায়াফ্রামের উপরিতল দেখানো হয়েছে

পাঁজরের অস্থি, ফুস্ফুস্ , ডায়াফ্রামের এবং উদরের পেশির সম্মুখভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. কণ্ঠাস্থি রীতি (Clavicular method) এই রীতিতে শ্বাসগ্রহণের সময় কণ্ঠের অস্থি উঁচু হওয়ায় এবং পাঁজরের উর্ধ্বভাগের পেশি ক্রিয়াশীল হওয়ায় বিস্তৃত ফুসফুসের অবস্থানের জন্য কিছুটা ফাঁক সৃষ্টি হয়। এই রীতিতে অন্য দুই রীতির মতো বায়ুকোষের জন্য বেশি জায়গার সঙ্কুলান সম্ভব হয় না। এই রীতিতে সবচেয়ে কম শ্বাসগ্রহণ ও সবচেয়ে স্বল্পকাল শ্বাস ধরে রাখা সম্ভব। গলা ফুলিয়ে খুব ছোট করে এই শ্বাস নেয়া হয়। তাই এ রীতিতে গান বা অভিনয়ের জন্য ঘনঘন শ্বাস নিতে হয়। এই রীতিতে কণ্ঠ ও স্বরযন্ত্রের পেশিতে অধিক চাপ পড়ায় ঐ দুটি বস্তুর উত্তেজনার পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। তার ফলে শব্দোচ্চারণে বৈচিত্র্যসৃষ্টি এবং স্বরশক্তি বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

প্রশ্বাস-নিশ্বাসের ব্যায়াম

স্বরবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে বক্ষগহ্বরের নিম্নভাগ এবং উদর বিশেষভাবে সহায়ক হয়। এজন্য কাঁধ বা বুকের খাঁচার ওপরের দিকটায় বেশি জোর না পড়াই ভালো। 'দ্রুত শ্বাসগ্রহণ, সর্বাপেক্ষা বেশি সময় ধারণ, ধীরে শ্বাসত্যাগ',—শ্বাস নিয়ন্ত্রণের এটাই মূল সূত্র। প্রশ্বাস এবং নিশ্বাসের কয়েকটি ব্যায়ামের নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। এগুলো দিয়ে প্রশ্বাস-নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

১. মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, এবার অনুভব করুন পেছন দিক (পৃষ্ঠদেশ) যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাঁধ ও পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত হয়েছে এবং মাথাকে টেনে লম্বা করা হয়েছে পেছন থেকে। মেঝেতে শুধু শুয়ে থাকার অনুভূতি নয়, মনে করতে হবে শরীরটাকে বিস্তৃত করা হচ্ছে পেছন থেকে।
অনুভব করুন কাঁধ, ঘাড় এবং হাত তাদের সন্ধিস্থল (জয়েন্ট) থেকে একে অন্যের থেকে মুক্ত আছে এবং খেয়াল রাখতে হবে এতে যেন কোন চাপ না পড়ে।

২. এবার আপনার হাত দুটো বুকের পাঁজরের প্রশস্ত জায়গায় রাখুন।
   - প্রথমে শ্বাস নিয়ে পরে শব্দের সাথে সব বাতাস বের করে দিন। এবার পাঁজরের মধ্যের পেশিগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করার প্রয়োজন অনুভব করছে ততক্ষণ দেরি করুন। আবার শ্বাস ভরতে থাকুন আস্তে আস্তে এবং পাঁজর পেছনে ও পাশে যে বিস্তৃত হচ্ছে তা অনুভব করুন। বুকের উপরের দিকটা চেষ্টা করে উপরের দিকে টেনে তুলবার চেষ্টা করবেন না।
   - শ্বাস নিন, ১০ পর্যন্ত গুনতে গুনতে সমান বিরতিতে ধাক্কা ছাড়াই বাতাসটা বের করে দিন। লক্ষ্য রাখুন যে পাঁজরের পেশিগুলোই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এইভাবে স্থায়িত্বকাল বা গোনার সংখ্যা ১৫ করুন এবং তা বাড়িয়ে ২০ পর্যন্ত করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

- পূর্ণ মাত্রায় শ্বাস গ্রহণ করুন, এক হাত ডায়াফ্রামের ওপর রেখে আওয়াজ করুন কয়েকবার। আস্তে কিন্তু শক্তভাবে, যাতে বোঝা যায় কোত্থেকে শ্বাস শুরু হচ্ছে। এইবার এই সাথে সামান্য জোরে আর' শব্দ করুন, এবার ড্রাম বাজনার মতো এটা ছুঁয়ে যান। এবার আরো সংহত ধ্বনি 'আহ্', 'আয়' এবং 'আই' সৃষ্টি করুন। শ্বাস বা বাতাসকে এর সাথে যুক্ত করুন।
- শ্বাস নিন, যাতে পাঁজরগুলো আরো উন্মুক্ত হয়। এক হাত ডায়াফ্রামের ওপর রাখুন। এবার খোলা গলায় অনায়াস ধ্বনি নির্গত করুন। আবার শ্বাস নিন এবং ঐ শ্বাসে ৬ পর্যন্ত জোরে জোরে গুনুন। এবার কোনো একটা সংলাপের অংশবিশেষ যেটা আপনি জানেন, সেটা বলুন। লক্ষ্য রাখুন, প্রত্যেকবার বলবার সময় প্রথমেই শ্বাস ভরে নিয়েছেন কি না। যাতে শ্বাসের সাথেই শব্দ শুরু হয়। শ্বাসের সাথে শব্দের উৎস খেয়াল করতে থাকুন। সবসময়েই খেয়াল রাখবেন যাতে ঘাড় এবং কাঁধ সম্পূর্ণ মুক্ত (free & relax) থাকে।

৩. বসা অথবা দাঁড়ানো অবস্থায়, ঠিক অবস্থান গ্রহণের পর পিছন দিক যাতে বিস্তৃত ও লম্বমান হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

- এবার 'মাথা' সামনে ঝুলিয়ে দিন এবং আস্তে উপরে তুলুন, অনুভব করুন যেন পেছনের পেশি ঘাড়কে টেনে তুলছে।
- এবার মাথা পেছনে নিয়ে যান এবং আস্তে তুলে নিয়ে আসুন।
- এবার মাথা পাশে নিয়ে যান এবং আস্তে আস্তে টেনে তুলে আনুন।
- এবার মাথাকে চারদিকেই আস্তে করে ঘোরান এবং একইভাবে উল্টোদিকে (clockwise & anti-clockwise) ঘোরান।
- মাথাকে একটু শক্ত করে পেছনে নিন। এবার শরীর শিথিল করুন এবং পার্থক্য অনুভব করুন।
- মাথাকে পেছন দিকে নিয়ে আস্তে নাড়াতে থাকুন, অনুভব করুন যেন ঘাড়ের মাংস পেশিগুলো মুক্ত আছে।
- মাথা ছেড়ে দিয়ে চারদিকে ঘোরান এবং এই নড়াচড়া যে মুক্তভাবে হচ্ছে সেটা অনুভব করুন,যাতে মাথা ঠিকই থাকে কিন্তু শক্ত না থাকে।
- এবার 'কাঁধ' তুলুন এবং আস্তে নিচে ঝুলিয়ে দিন, এইভাবে কয়েকবার করুন। কাঁধ ছেড়ে দিলে কেমন লাগে বা অনুভূতি হয় সেটা খেয়াল রাখুন।

৪. হাত মাথার পিছনে রাখুন, যতখানি সম্ভব শরীরকে শিথিল রাখুন, শ্বাস নিন ও শব্দ করুন। শেষটি আস্তে করুন, যতক্ষণ পাঁজর বড় হতে চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঁজর সম্প্রসারিত করুন এবং বুক ভরে শ্বাস নিন। এভাবে দু'তিনবার করুন। এই পদ্ধতিতে বুক অনেক উন্মুক্ত হয়।

* হাত নামান অথবা পাঁজরের দুইপাশে হাত রাখুন, পূর্ণ শ্বাস নিন এবং ১০, ১৫ ও ২০ গুনতে গুনতে সেই বাতাস বের করে দিন। লক্ষ্য রাখুন যে পাঁজরের পেশিগুলোই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
* শ্বাস নিন ও আওয়াজ দিন ডায়াফ্রাম থেকে—'আর' বলুন, শ্বাস অনুভব করুন এবং সেই সাথে শব্দও। এরপর আরও সংহত ধ্বনি 'আহ' এবং 'আই' নিয়ে চর্চা করুন। যখন আপনি অনুভব করবেন শ্বাস পুরো মাত্রায় জমা আছে, তখন কিছু সংলাপের অংশ ওই শ্বাসে বলার চেষ্টা করুন।

৫. প্রথমে পাঁজরের সাহায্যে (ঊর্ধ্বসঞ্চরণ) কিছুটা শ্বাস নিন। তারপর ডায়াফ্রামের সাহায্যে আরো কিছুটা শ্বাস নিন। ৫ সেকেন্ড শ্বাস ধরে থাকুন। মনে মনে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনে মুখ দিয়ে সমানভাবে ধীর গতিতে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। আবার ২ সেকেন্ড থামুন। আবার ১০ গুণে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। আবার থামুন। আবার একইভাবে কিছুটা শ্বাস ছাড়ুন। এইভাবে অন্তত চারবারে সব শ্বাস ছাড়তে হবে।

৬. উপরের অনুশীলনে শ্বাস ছাড়ার সময়ে 'আ' স্বরটি একটি নির্দিষ্ট পর্দায় ধরে রাখুন। আবার শ্বাস নিয়ে শ্বাস ধরে রেখে মুখ বন্ধ করে 'হাম' (hum) ধ্বনি বা humming sound সৃষ্টি করতে থাকবেন।

৭. আগের কায়দায় বসে বা দাঁড়িয়ে শ্বাস নিয়ে তাকে ধরে রেখে একবার S-এর ধ্বনি, আর একবার **'Sh'**-এর মতো ধ্বনি ফিসফিস করে সৃষ্টি করবেন। এ সময় মুখ সামান্য খোলা থাকবে।

৮. স্বরস্থান-এর কেন্দ্রে উদ্দীপনা জাগানোর ব্যায়াম করতে হবে, 'হি' শব্দে আওয়াজ বা শব্দ প্রক্ষেপণ করতে হবে
— একদম নিচু থেকে একদম উঁচুতে যাওয়া
— খুব নরম থেকে খুব চিৎকার শব্দে যাওয়া
— অনেক দূর থেকে একদম কাছে আসা
এই একই ব্যায়াম কিন্তু 'হা' শব্দে করতে হবে।

৯. **প্রাণায়াম :** সাধারণ অবস্থায় আমরা ধীর গতিতে শ্বাস গ্রহণ করি। দ্রুতগতিতে শ্বাস ত্যাগ করি এবং সবশেষে একটু বিরতি দিই। দীর্ঘ সংলাপ বলার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে দম ধরে রাখার জন্য ও সেই দমকে প্রয়োজন অনুযায়ী একটু একটু করে ছাড়বার জন্য অভিনয় শিল্পীর দরকার দ্রুত শ্বাস গ্রহণ, ধীর গতিতে শ্বাস ত্যাগ এবং সবশেষে যুক্তিসম্মত বিরতি। এই নিয়ন্ত্রিত গভীর শ্বাসক্রিয়ার নাম 'প্রাণায়াম'।

* পিঠ সোজা করে বসুন, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডানদিকের নাকের ছিদ্রটি

বন্ধ করুন, বাঁদিকের নাকের ছিদ্রটি দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে থাকুন, কুড়ি সেকেন্ড দম বন্ধ করে রাখুন, এইবার কড়ে আঙুল বা অনামিকার সাহায্যে বাঁদিকের ছিদ্রটি বন্ধ করুন, বুড়ো আঙুলটি ডান নাক থেকে তুলে নিন, ডান নাক দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধরে আস্তে আস্তে বাতাস বের করে দিন, আবার নতুন করে বাতাস ঐ ডান নাক দিয়ে টেনে নিন, এইভাবে ক্রমান্বয়ে করতে থাকুন।

চিত্র ১৮

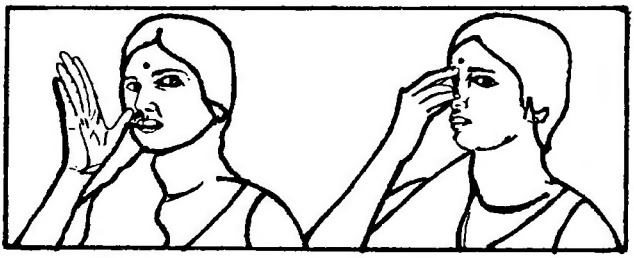

প্রাণায়াম পদ্ধতি

রোজ পাঁচ থেকে দশ মিনিট অভ্যাস করতে হবে। রাতে শোবার আগে অথবা খুব ভোরে করলে ভালো। শ্বাসগ্রহণ যতদূর সম্ভব গভীর হওয়া চাই। শ্বাস নেয়ার ও ছাড়বার সময় পেটটি ফুলবে ও চুপসে যাবে। ডায়াফ্রাম ব্রিদিংয়ের এই রীতিটি এখানে মানতে হবে।

নিয়মিত প্রাণায়াম করলে দম বাড়বে এবং দম ধরে রাখাও শেখা যাবে। গভীর ও ছন্দিত শ্বাসক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মাবে। স্নায়ুমণ্ডলী সব সময় সতেজ ও সক্রিয় থাকবে। ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা বাড়বে। স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি শানিত ও মার্জিত হয়ে উঠবে। গভীর অভিনিবেশের ক্ষমতা আসবে। যাদের 'সাইনাস' অথবা বধিরতা আছে তাদের জন্যে এই প্রাণায়াম খুব উপকারী।

১০. প্রচণ্ড হাঁপিয়ে পড়লে কুকুর যেভাবে জিভ বের করে শ্বাস নেয়, ঠিক সেই ভাবে বসে অথবা দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত শ্বাস নিন ও ছাড়ুন।

এইভাবে পনেরো-কুড়িবার করার পর বিশ্রাম নেবেন—আবার করবেন। জিভটি বেরিয়ে থাকবে সারাক্ষণ। শুধু পেটটাই ওঠানামা করবে। মুখ দিয়ে সমান গতিতে করাত দিয়ে কাঠ কাটার মতো আওয়াজ বেরোবে। কবার করা হলো মনে মনে গুনবেন। কাশি এলে একটু জল খেয়ে নেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুশীলন করার জন্য একদমে কতটা বলা যায় পরীক্ষা করা যাক—

ক. 'তোমাদের এই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'

[রক্তকরবী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

খ. এই প্রধূমিতা প্রজ্জ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা পুষ্পোজ্জ্বলা সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য!

[চন্দ্রগুপ্ত-ডি.এল.রায়]

গ. 'যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরি করে তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল, রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে— এই সেই মা।

[চন্দ্র গুপ্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরের নমনীয়তা অর্জনে শরীরের ব্যবহার

পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে, সুস্বর তৈরির জন্য এবং স্বরের নমনীয়তার জন্য শরীরের ব্যবহার, অঙ্গের ব্যবহার, অঙ্গের শিথিলীকরণ প্রয়োজন। এ কারণে শরীরের কোথায় কি যন্ত্র আছে এবং তারা কিভাবে স্বরের জন্য কাজ করে এই সংক্রান্ত কিছু ব্যায়ামের কথা সচিত্র আলোচনা করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

মাথা/ঘাড়/পিছন সম্পর্ক

প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই মাথার সাহায্যেই সব ধরনের মুভমেন্ট করে থাকে। মানুষের দেহের কার্যপ্রণালীও এইভাবেই হয়ে থাকে। মানুষ আবার অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর মতো নয়। মানুষের এই ধরনের ব্যবহার না করার ক্ষমতাও রয়েছে। আবার ঐকান্তিক বাধা দেয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। প্রাণী হিসেবে মানুষের সেরা দক্ষতা হলো মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা। আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষ পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে গিয়ে তার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন এনেছে। সুদূরপ্রসারী ফল হলো ব্যক্তিগত ক্ষতি। প্রায়ই এবং বলতে গেলে অহরহই এই কাজ করছে মানুষ।

মাথা এবং মেরুদণ্ডের পরস্পর সম্পর্কের কারণেই শরীরের সমতা বা অসমতা তৈরি হয়। আমাদের অন্তঃকর্ণের একটা কাজ হলো আমাদের শরীরে সমতার অবস্থান সম্পর্কে মগজে খবর পাঠানো। স্বাভাবিক অবস্থায় মগজ এই খবরে সাড়া দিয়ে সমতা বজায় রাখা বা সমতা অর্জনের জন্য মাথাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। মাথা নির্দেশ গ্রহণ ক'রে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে সারা শরীরে সম্প্রচার করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মাথার নেতৃত্বে কাজ করার এই গুণ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় সাপের মুভমেন্টের মধ্যে। সাপের মাথা যেখানে আছে, সেই অনুযায়ী সাধারণত তাদের শরীরও একই মুভমেন্ট অনুকরণ করতে থাকে। এই একই ধরনের আরেকটি বিষয়, বেড়ালের একটি টেবিলের ওপর লাফ দেয়া। বেড়ালটা লাফ দেয়ার সময় কিন্তু টেবিলের উপরটা দেখতে পায় না। লাফ দেয়ার আগে বেড়াল তার শরীরের ভর ও শক্তি নিচে জমা করে। তারপর সবেগে লাফের মধ্যে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে অন্য পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যায় এবং সাথে সাথে পুরো শরীরটাও তার পিছনে পিছনে যায়। টেবিলের উচ্চতায় গিয়ে বেড়ালটা দেখতে পেল, যেখানে সে নামবে বলে ঠিক করেছে সে জায়গায় জিনিসপত্রে ভর্তি। সেখানে নামাটাও মুশকিল। তখন সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার লাফ দেয়ার সময় দেখা যাবে বেড়ালটা মাথা ও ঘাড়কে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে এবং পিছন শরীরের কোনো সাহায্য ছাড়াই টেবিলের একটি নিরাপদ জায়গায় নামতে পেরেছে লাফের সাহায্যে। অথবা দেখা গেল সেই মুহূর্তে বেড়ালটা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং মাথা ঘুরিয়ে, সেই সাথে সাথে শরীরকেও ঘুরিয়ে মাটিতে নেমেছে সামনের দুই পায়ের উপর প্রথমে ভর দিয়ে।

সাপ এবং বেড়াল মাথা দিয়ে যেভাবে কাজ করে সেটা আমাদের পক্ষে কঠিন। মেরুদণ্ডের হাড়ের সারির ওপর যদি বেড়ালের মত মুখ বসাতে পারতাম, তাহলে প্রথমেই মাথা নিয়ে কাজ করার ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত। কিন্তু বেড়াল ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকায় কাজটা একটু জটিল হয়ে ওঠে। আমরা মানুষেরা দ্বিপদবিশিষ্ট। আমরা যেদিকে যাই, সেদিকেই মুখ থাকে সাধারণত—সামনের দিকে। কিন্তু বেড়ালের মতো মেরুদণ্ড ওপরে ওঠে না। তাই আমরা সবসময় একই সাথে দুই ধরনের গতি কাজ করছে দেখতে পাচ্ছি। 'সামনের দিকে'—যেদিকে আমাদের মুখ চেয়ে আছে এবং 'উপরে' যেদিকে মেরুদণ্ড তাক করে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, মাথার খুলির সমতা রক্ষার জন্য আমরা যদি এই দুটি গতির কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজ-সরল করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে শরীরে অসমতা দেখা দেবে। চোখ ও মুখের কাজের জন্য যদি আমরা মেরুদন্ডের থেকেও মাথাকে অনেক সামনে এগিয়ে নিই, তাহলে সমতা থাকবে না। এই সমতা ঠিক করার জন্য মাথাকে তার নিজের ঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে। অথবা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশকে শক্ত করে বা শরীরের কিছু অংশ পিছনে ঠেলে দিয়ে বেশি সামনে মুখ নেয়ার ক্ষতিটা পুষিয়ে যায়। আমরা যদি এর কোনো একটি ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ভঙ্গিকে স্থির করে রাখি, তাহলে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। শুরু থেকেই সমগ্র ব্যাপারটাই ভুল হবে এবং আমরা শরীরের নমনীয়তাও হারাবো। উদাহরণস্বরূপ, এই ধরণের ঘটনা খুব সহজেই ঘটতে পারে একজন অদূরদর্শী লোকের ক্ষেত্রে। সে চোখ নিয়ে সমস্যায় পড়বে। এটা নির্ভর করে তার চোখ কিসের ওপর স্থির নিবদ্ধ তার ওপর। সে চোখ মাথাসহ সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ভালো দেখবার জন্য। ঐ ব্যক্তির নিজের কোনো খেয়ালই নেই যে, সে তার পাঁজরের খাঁচাকে নিচে ঠেলে দেয় এবং শরীরের নতুন অবস্থানের সমতা রক্ষার জন্য পা দুটোকে ভীষণ শক্ত করে ফেলে। সময়কালে এই ধরনের অবস্থানের পরিবর্তন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এমনকি ভালো দেখবার জন্য সত্যিই যদি সে একজোড়া ভালো চশমা পায় এবং দেখবার জন্য যদি তাকে আধ-বোঝা চোখের সামনে ঝুঁকতে নাও হয়, তবু শরীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের জন্য যথাযথ পরিবর্তন আনতে সে সমর্থ হবে না। কোনো অভিনেতার জন্য শরীরকে এইভাবে এক জায়গায় স্থির করে ব্যবহার করা মারাত্মক ক্ষতিকারক। কারণ তার ব্যবহারকে ব্যাখ্যাকারীর মতো ব্যবহার করে শরীরের ব্যবহারকে নির্দেশ দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পালাক্রমে সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

আমরা এতক্ষণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে পারলাম। বিষয়টি হলো শরীরের সঠিক ব্যবহার। মাথা সামনের দিকে মুখ করে থাকবে এবং যতটা সম্ভব উপরের দিকে উঠবে। যেহেতু মাথা উপরে উঠছে, তাই ঐ অবস্থান তৈরির জন্য ঘাড়কে যথাসম্ভব মুক্ত রেখে ধ্বনি উৎপাদন করতে হবে। যদি আমরা ঘাড়কে শক্ত ও সঙ্কুচিত রাখি এবং দিক ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা হারিয়ে ফেলি, মাথার খুলির সমতা তখন হারিয়ে যায়। এই সমতাটুকু হারালে শরীরের অন্য অংশগুলির সমতা অর্জনের সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। কেননা ঘাড়ের মধ্যে দিয়েই শরীরের সমতা বা ভারসাম্য রাখার নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। যদি ঘাড়ের হাড়গুলি একে অন্যের সাথে ঠিক অবস্থানে না থাকে তাহলে শ্বাসক্রিয়া মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গলার আয়তনও পরিবর্তিত হবে। অনুনাদ বা অনুরণন এবং সুর বাঁধনেও এর ফলে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

এবার দ্বিতীয় বিষয় আলোচনা করা যাক। বিষয় হলো ঘাড় অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। যে মুহূর্তে ঘাড় মুক্ত করে আলগা করা হয়, মাথা সামনে মুখ করে এবং উপরে ওঠে। সমগ্র মেরুদণ্ড মাথা ঘোরার সাথে সাথে সেই অনুযায়ী নড়াচড়া করবে। এসময় পিছনটা লম্বা হবে। পিছন লম্বা হওয়ার সাথে সাথে কাঁধ ঠিক অবস্থান খুঁজে পাবে। পাঁজরের হাড়ও তার নিজস্ব আয়তন ফিরে পায়। পিছন শুধু লম্বাই হয় না চওড়াও হয়।

মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি সামনে পিছনে যেতে পারে এবং কিছুটা ঘুরতেও পারে। সেজন্য মেরুদণ্ড ধনুকের মতো নড়াচড়া করতে পারে এবং খুব নমনীয়ভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুরতে পারে। সমগ্র মেরুদণ্ড নমনীয়তার কারণে শরীর দুমড়ে মুচড়ে নানান অঙ্গ-সঞ্চালন তৈরি করতে পারে। মেরুদণ্ড, ঘাড় এবং কটিদেশ এলাকায় স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বাঁকও রয়েছে। একদিকে অথবা অন্যদিকে মেরুদণ্ডের হাড়ের বেশি কাত হওয়ার কারণে আমাদের মাথা নির্দেশিত দিক হারাই; ফলে মেরুদণ্ডের যদি অতিরিক্ত বাঁক দেখা দেয় অথবা একদিকে হওয়ার কারণে বাঁক নষ্ট হলে অন্যটা দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই মেরুদণ্ডে সঠিক ও ভারসাম্যযুক্ত সম্পর্ক অর্জিত হলে মেরুদণ্ড লম্বা হয়।

সব শেষে আমরা সার কথা বলি :

ঘাড় অবশ্যই মুক্ত থাকবে।

মাথা সামনে মুখ করবে এবং উপরে উঠবে।

পেছন লম্বা হবে এবং চওড়া হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সাথে পা ও পায়ের পাতারও সম্পর্ক আছে। মাথার নির্দেশে পিছন লম্বা ও চওড়া হওয়ার সাথে সাথে পা ও পায়ের পাতার সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়। পিছনকে কার্যক্ষম ও সচল রাখবার জন্য পা' শক্ত করা চলবে না। পেটের পেশি শক্ত করা, নিতম্বদ্বয় পরস্পর শক্ত করে চেপে ধরা এবং হাঁটুকে পিছনে নেয়া চলবে না। পা দুটো এই নতুন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নিতম্ব, হাঁটু ও গোড়ালির সন্ধিতে উত্তেজনা মুক্ত করে দেয়া হয়। তাই হাঁটার সময় শরীরের ভর-এর স্থানান্তর সহজ ও সুষম হয়। নিতম্ব, হাঁটু এবং গোড়ালির অস্থিসন্ধি শক্ত করে ধরে রাখলে বা বন্ধ করে রাখলে শব্দ উচ্চারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পিছনও এই কারণে ভুগবে। দাঁড়ালে অস্থিসন্ধিগুলিকে যথাসম্ভব মুক্ত ও নরম রাখতে হবে। যেন মনে হয় শরীরটা নড়াচড়ার মধ্যে রয়েছে। তারপর শরীরের ভর গোড়ালি, পায়ের পাতার বাইরের দিক, পায়ের অস্থিসন্ধির বল এবং পায়ের আঙুলের মধ্য দিয়ে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। পায়ের সবটা মিলে এক ধ্রুপদী পদচিহ্নের রূপ তৈরি করে।

তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, হাঁটু মুক্ত থাকার কারণে কিছুটা সামনে এসেছে এবং প্রধানত পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে।

সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ও সঠিক নির্দেশনাসহ দাঁড়ালে এটা সহজেই অনুভব করা যায় যে, খুব সহজেই যে কোনো দিকে শরীর নড়ানো বা ঘোরানো যায়।

চিত্র ১৯

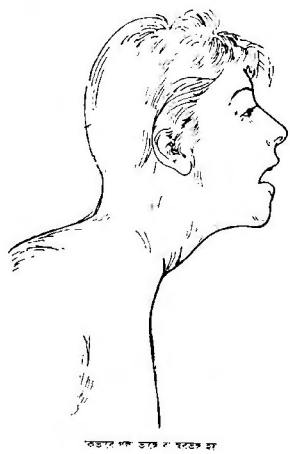

কিভাবে গলা ভাঙে বা স্বরভঙ্গ হয়

কথাবার্তা চলার সময় নিজের কথা আরেকজনের কাছে পৌঁছানোর জন্য কতগুলি খারাপ অভ্যাস তৈরি হয়। যেমন, কথা বলার সময় গলা থেকে মুখকে সামনে

অনেকটা এগিয়ে নিয়ে আসা এবং নিচের চোয়ালের হাড় অনেকটা উপরে তুলে ধরা। ফলে ঘাড় ও গলার চাপাচাপি ও এক জায়গায় উপনীত হওয়ার কারণে সাহায্যকারী শ্বাস থেকে যে স্বর শক্তি তৈরি হয় তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেই মুহূর্তে গলায় যত উত্তেজনা তৈরি হবে এবং যত চিৎকার শব্দে ধ্বনি তৈরি করবে ততই সে তার গলায় ধাক্কা বা চাপ দিতে থাকবে। ক্রমশই এইভাবে ধ্বনি সৃষ্টি করতে করতে গলা ভাঙবে এবং একধরনের স্থায়ী স্বরভঙ্গের সৃষ্টি হবে। স্বরের এই ধরনের অপব্যবহার প্রায়শই হাঁপানির কষ্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

চিত্র : ২০

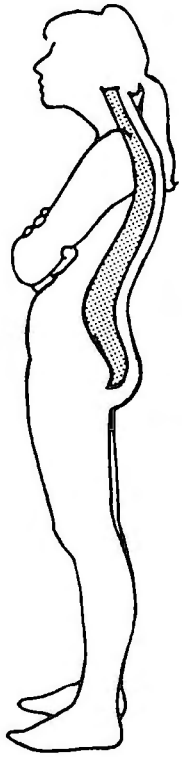

স্বরের অনুদাত্ততার জয়—ক্রিয়াশক্তি অচল

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সব কিছু টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনা হচ্ছে। বুকের পাঁজরের ওঠানামায় এই কারণে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং স্বর উৎপাদনও প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র ২১

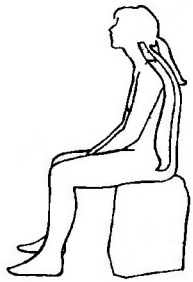

বসবার ভঙ্গিটাই চাপ দিয়ে নিচু করার মতন এবং ধ্বনিও সৃষ্টি হবে ঐ রকম

এই বসবার ভঙ্গিতে সবকিছু নিচের দিকে নামিয়ে আনা হয়েছে। ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং মাথার খুলি পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণের জন্য। ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঘাড় ও গলা মিলেমিশে চাপাচাপি হচ্ছে। কোনো পথ খোলা থাকবে না। শ্বাস-এর সাহায্য তখন কাজ করবে না। গলা থেকে যে ধ্বনি তখন তৈরি হবে তা ম্যাড়মেড়ে লাগবে এবং কোনো জোরও থাকবে না সেই ধ্বনিতে।

চিত্র ২২

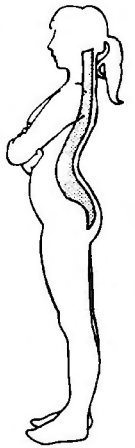

স্বরের অনুদাত্ততা কাটানোর চেষ্টা—শক্তি ক্ষয়

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘাড়ের থেকে মেরুদণ্ডের একটা অংশ পর্যন্ত পেছনে টেনে নেয়া হয়েছে এবং পা দুটো শক্ত, টানটান, সোজা ক'রে এবং হাঁটু দুটোকে শক্ত ক'রে আটকে দিয়ে নিচের পাঁজরের নড়াচড়া কমিয়ে দিচ্ছে। এই সাথেই বক্ষপ্রদেশের উপরের অংশ থেকেও শ্বাসগ্রহণ চালাতে হয় বাধ্য হয়ে। ফলে গলা অতিরিক্ত শক্ত হয়ে যায় এবং অনেক উঁচু ও তীক্ষ্ণ স্বর উৎপন্ন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র : ২৩

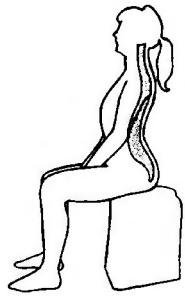

বসবার ভারসাম্য নষ্ট এবং পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথার সৃষ্টি

ছবিতে দেখা যাচ্ছে সোজা হয়ে বসা হয়নি। পেছনদিকে পৃষ্ঠদেশ এমনভাবে টেনে নেয়া হয়েছে যে, উদর সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। ফলে তলপেটের পেশিতে অযথা চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। কণ্ঠের স্বরেও সেই প্রতিফলন ঘটবে। অর্থাৎ স্বরেও সেই শক্ত ভাব বা চাপ তৈরি হবে।

চিত্র : ২৪

অভিকর্ষ ব্যবহারে ভারসাম্য আনা

এই ছবিতে মেরুদণ্ডের বাঁক স্বাভাবিক। মেরুদণ্ড পূর্ণ প্রসারিত হয়েছে এবং শ্বাসে নড়াচড়াতে ও স্বরে পূর্ণ নমনীয়তা তৈরি হয়। শরীরের এই সুন্দর ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেক পেশি ও অস্থি-সন্ধি মুক্ত থাকে। ফলে 'কেমন স্বর তৈরি করতে হবে এবং কেমন নয়' নির্ধারণ করে উপযুক্ত স্বর তৈরি করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র : ২৫

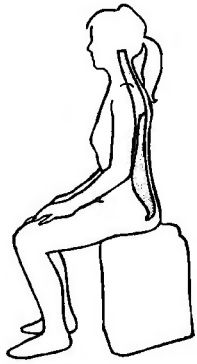

আরামে বসা

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বসা অবস্থায় মেরুদণ্ডের বাঁক স্বাভাবিক রয়েছে। শরীরের ভরও বসবার হাড়গুলির ওপর ভারসাম্য বজায় রয়েছে। পা-এর দিকে তাকালে দেখা যাবে—পা দুটি নমনীয় ও নরমভাবে আছে এবং কোনো শক্ত ভাব নেই। শ্বাসগ্রহণের সময় যে পেশিগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোও মুক্ত রয়েছে। এই অবস্থায় ইচ্ছামত স্বর উৎপাদন সম্ভব।

চিত্র ২৬

অভিকর্ষের সাথে সখ্যতা
Making Friendship with Gravity

শরীরের ভারসাম্য অবস্থাকে সহজ করা

শরীরের ভারসাম্য ঠিকমতন না থাকলে সঠিক স্বর উৎপন্ন হবে না। সেজন্য ভারসাম্যকে সহজ সম্পর্কে পরিণত করতে হবে। পিছন দিয়ে মেঝেতে শুতে হবে। প্রথমে মাথার নিচে কয়েকটি বই দিয়ে শুতে হবে। মাথাটা মেঝেতে ঝুলে পড়বে না। বেশি বই মাথার নিচে দিলে আবার মাথা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে। যে উঁচুতে মাথা আরামে শোয়ানো থাকবে সেই পর্যন্ত বই-এর উচ্চতা হলে ভালো হয়। পা ছড়িয়ে দিলে পিঠে একটা ফাঁক তৈরি হতে পারে। পৃষ্ঠদেশকে জোর দিয়ে নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা আপনা থেকেই নিচে চলে আসবে ভার ছেড়ে দিলে। সেজন্যেই হাঁটু আকাশের দিকে মুখ করে এবং পায়ের পাতা মেঝেতে পেতে এই অবস্থানে রাখতে হবে। পা ফাঁক থাকবে এবং হাঁটুও ফাঁক থাকবে। হাত দুই পাশে থাকবে এবং কনুই দুটিও দুই পাশে বাঁকানো থাকবে, যাতে কাঁধ মুক্ত থাকে। হাতের পাতা মেঝেতে পেতে রাখতে হবে। অসুবিধা হলে হাতের পাতা পেটের উপরে রাখতে হবে কুঁচকির কাছাকাছি। প্রয়োজনে কনুই ও কবজির নিচে ছোট বালিশ রাখা যেতে পারে আরামদায়ক অবস্থানের জন্য।

এই অবস্থায় থাকাকালিন কোনো চাপ প্রয়োগ ঠিক নয়। যা কিছু ঘটে তা ঘটতে দেয়া উচিত।

ঘাড়টা মুক্ত রাখা দরকার।

মাথাটা একটু উপরে নিতে হবে (যাতে মেরুদণ্ড একটু লম্বা হয়), ঠিক রাখতে হবে যে সামনের দিকে মাথা থাকবে। মেঝের সমান্তরালভাবেই মাথার অবস্থান হবে।

পেছন দিকটা লম্বা টানটান করতে হবে এবং সেই সাথে পিঠটা চওড়া করতে হবে।

অস্থিসন্ধি মুক্ত রাখতে হবে। মাংসপেশিকে চাপ দিয়ে এটা করা ঠিক নয়। কোনো কিছু নিজে না ক'রে, ঘটতে দেয়া উচিত। এই অবস্থায় থাকলে অনেক শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব এবং ঠিকমতন গলার স্বরকে সুরে বাঁধা যায়। তবে এই অবস্থানে বেশিক্ষণ থাকলে ঘুম ঘুম বা নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং অচলাবস্থা বা অতিরিক্ত মুক্তাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য ব্যায়াম করার আগে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট এই ব্যায়াম করলে ফলদায়ক হবে। নিয়মিত করলে 'মাথা/ঘাড়/পিছন সম্পর্ক' বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে এবং পরিবর্তনটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে। কাজ করতে গেলেও এই পরিবর্তন পরিষ্কার বোঝা যাবে।

'মাথা/ঘাড়/পিছন সম্পর্ক' কাজে লাগানোর জন্য এত সময় ব্যয় সত্ত্বেও জোর দিয়ে উঠতে গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। গড়িয়ে গিয়ে এবং ঘুরে, হাত এবং কনুইয়ের সাহায্যে আরামে উঠতে হবে। এই পদ্ধতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং মাথাকে সর্বাগ্রে রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

শেষে যখন উঠে দাঁড়াবেন তখন পায়ের দিকে নজর দিতে হবে। প্রায়শই পায়ের কাঠিন্যের কারণে পিছনটা সামনের দিকে এগিয়ে আসে। আবার তখন থামতে হবে অথবা এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য জড়তাকে কাজে লাগাতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে মেঝের উপর শুয়ে ব্যায়ামটি করতে হবে। অভিনেতা যেখানে যেমনই হাঁটুক, চলুক, বসুক বা জগিং করুক এই ব্যায়ামটি তাকে সাহায্য করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরের গুণগত মান নির্ধারণের উপাদান

স্বরের অনুরণন (Resonance)

স্বরতন্ত্রী থেকে আসা স্বরকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহের উপরের অংশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে তাকে পুনরায় রণিত করিয়ে স্বরের শক্তিবৃদ্ধি করাকে অনুরণন (Resonance) বলে। স্বরসৃষ্টিতে অনুরণন যেমন অন্য জায়গায় নতুন কম্পন জাগায়, তেমনি স্বরেরও পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে অন্য মাত্রা ও উজ্জ্বলতা প্রদান করে। স্বরযন্ত্রের কাছের ফাঁকা জায়গায়, গলবিলের, বক্ষগহ্বরের, কখনও কখনও উদর গহ্বরের, নাসিকা পার্শ্বস্থ গহ্বর ও নালির (Sinus) এবং মুখগহ্বরের হাওয়ার সংবেদনশীল কম্পনের সাহায্যে স্বর অনুরণিত হয়। কিন্তু ঐসব জায়গায় পেশির চাপে জোরে উচ্চারণ করলেই স্বরের শক্তি বাড়ে না। অনুরণনের বা অনুনাদের মাধ্যমে স্বরের শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়; আবার অনুরণনের কারণে স্বরের গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। মূর্ধা, জিহ্বা ও মুখগহ্বরের নড়াচড়ার ফলেই অনুরণন বাড়ে বা কমে। দেহের ঊর্ধ্বভাগের সমস্ত ফাঁকা জায়গার সমবেত প্রচেষ্টায় অনুরণন তৈরি হয়; কোনো একটি জায়গা থেকে সম্পূর্ণ অনুরণন সম্পন্ন হয় না। তবে উচ্চারণের বিশিষ্টতার জন্যে কোনো কোনো স্থানে অনুরণন বেশি হয়।

কথা বলার সময় মুখগহ্বরের পেছনে খোলা থাকলে এবং গলবিল বিস্তৃত হলে মুখের অনুরণন বাড়ে। মধ্যমস্বরে মুখগহ্বরের অনুরণন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। উচ্চস্বরে এর উপরের অংশ অনুরণিত হয়। উচ্চস্বরে অন্য দুই প্রকার স্বরের চেয়ে অনুরণন কম হয়। নিম্নস্বরে বক্ষগহ্বর ও মুখগহ্বরে অনুরণন সৃষ্টি হয়। অনুরণন বাড়াবার জন্য সবসময় ওষ্ঠ ও জিহ্বার গতিবিধির উপর জোর দিতে হয়।

স্বরের অনুরণন বৃদ্ধির ব্যায়াম

স্বরের উৎপত্তি স্বরতন্ত্রীতে। কাছের দূরের লোককে শোনানোর জন্য অনুরণন দ্বারা এর শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এতে শুধু স্বরের শক্তিই বাড়ে না, স্বরও সম্পদশালী হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন কয়েকটি ব্যায়ামের কথা আলোচনা করা হচ্ছে :

ক. জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আলতো করে মুখ বন্ধ করুন। তারপর মধ্যমাত্রায়, নাক দিয়ে গুনগুন করতে থাকুন। 'উম' এই humming ধ্বনি দিয়ে গুঞ্জন করলে ভালো হয়। মনে করুন স্বরকে মাথার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, যতটা পারা যায়। তাতে মুখের হাঁড়ে কাঁপন অনুভব করবেন। ঠোঁট সামান্য কাঁপবে। মাথা একটু ঝিমঝিম করতে পারে—যতদিন এতে পুরো অভ্যস্ত হয়ে না উঠছেন ততদিন অভ্যাস চালিয়ে যান। তারপর মাঝে মাঝে মাত্রার পরিবর্তন করুন। কয়েকদিন পর মাঝে মাঝে ঠোঁট খুলে দেবেন। তাতে স্বর, গুরুর গুঞ্জন, মুক্তস্বরে পরিণত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে স্বর সংযোজনের পর গুঞ্জনধ্বনি আর বের না হয়। গলা স্বাভাবিক রাখুন। এই ব্যায়ামটি গলা শ্রুতিমধুর রাখতে সবচেয়ে কার্যকর।

খ. মুখ খুলে শ্বাস নেবেন, ৫ সেকেন্ড থেকে বাড়িয়ে ৮ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রত্যেকবার শ্বাস ছাড়বার সময় 'আ' ধ্বনি একটানা উচ্চারণ করুন। উচ্চারণের সময় সর্বদা স্বরে সমান জোর পড়বে। সহজ ও সমানভাবে ধ্বনি নির্গত হবে। স্বরের কোনো অংশ কাঁপবে না, অর্থাৎ নিটোল স্বর বার করতে হবে। স্বর নির্গমনের সময় ১৫ সেকেন্ড থেকে ক্রমে বেড়ে ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত হবে। পাঁচবার করতে হবে।

গ. মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে প্রথমে একটু টেনে উচ্চারণ করুন, পরে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করুন। উচ্চারণে যেন স্পষ্টতা থাকে এবং এইভাবে পাঁচবার করুন।

অংশ, ধ্বংস, কংস, বংশ, হংস, সিংহ

তুঙ্গ, ভৃঙ্গার, ভুজঙ্গ, মৃদঙ্গ, লঙ্ঘন, অঙ্কন, পুঙ্খানুপুঙ্খ, আকাঙ্ক্ষা।

ঘ. গলবিল খোলা রেখে ও চোয়াল শিথিল রেখে মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে এক নিশ্বাসে একটু টেনে টেনে উচ্চারণ করুন—মা, হা, কা, ছা, পা, দা, সা, চা, ফা, গা। ক্রমে উচ্চারণ দ্রুত করবেন এবং নিশ্বাসে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করবেন। উচ্চারণের স্পষ্টতা যেন ঠিক থাকে। এইভাবে পাঁচবার করুন।

স্বরপ্রাবল্য (Intensity)

স্বরের প্রাবল্য বলতে স্বরশক্তির তীব্রতাকে বোঝায়। সাধারণভাবে একে বলা যায় স্বরের জোর। স্বরতন্ত্রীর ওপর শ্বাসের চাপের নিয়ন্ত্রণেই স্বরের নিয়ন্ত্রণ। এখন, ঐ শ্বাসের চাপ যদি বাড়ানো যায়, তবে স্বরের জোর বাড়বে। ঐ চাপ কমিয়ে দিলেই স্বরের জোর কমে যাবে। স্বরের এই জোর বা স্বরপ্রাবল্য নির্ভর করে—

ক. ধ্বনি তরঙ্গের পরিসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. কম্পিত উৎসের আকার
গ. স্বর অনুরণিত হওয়ার বস্তুর সংস্থান
ঘ. উৎস থেকে দূরত্ব
ঙ. মাধ্যম-এর গাঢ়ত্ব

সচেতনভাবে, শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে স্বরের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাকেই স্বরের তীব্রতার নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। প্রথমেই 'আ' স্বর উচ্চারণ করে এই অভ্যাস করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে—

১. জোরে চেঁচিয়ে গলায় যেন চোট না আসে, ধীরে ধীরে স্বরতন্ত্রীর ওপর শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত তীব্রতা বৃদ্ধি করতে হবে ও ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।
২. এই চর্চার সময় স্বরস্থান যেন পরিবর্তিত না হয়। শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে তীব্রতা বৃদ্ধি করার সময় সাধারণত স্বরের পর্দা চড়ে যাওয়ার ও হ্রাস করার সময়ে নেমে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। সেই বিভ্রাট এড়িয়ে চর্চা করতে হবে।

স্বরের তীক্ষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি

এখন আমরা বাক্‌যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর ভিত্তি দাঁড় করাবো। প্রথমে, আমরা যে স্বাভাবিক গলায় কথা বলি, সেই স্তরে স্বরকে নামিয়ে এনে 'আ' স্বর বলতে হবে। এই স্বর ১. আমাদের স্বরতন্ত্রীর মাঝামাঝি ধরনের কম্পন থেকে তৈরি। ২. স্বর পরিবর্ধিত হচ্ছে বা অনুনাদ সৃষ্টি হচ্ছে মুখগহ্বরের ফাঁপা অংশে।

মুখগহ্বরের এলাকায় অনুনাদিত এই যে স্বর সৃষ্টি হলো, তাকে লিপটাং (lip tongue) জাত স্বর বা সংক্ষেপে লিপটাং-এর স্বরও বলা হয়।

এই স্বরটিকে আরও হাল্কা বা পাতলা ও তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে। যেন একটা ঠেলা দিয়ে নাকের দিকে তোলা হলো। এইভাবে, ধাপে ধাপে স্বরটিকে ক্রমশ পাতলা ও তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করলে ও উপরের দিকে ঠেলে তুলতে থাকলে, এক সময় অনুভব করা যাবে। ১. স্বরতন্ত্রীর দ্রুততর কম্পন থেকে স্বরটির উৎপত্তি, ২. স্বরের পরিবর্ধনের জন্য বা অনুনাদ সৃষ্টির জন্য মুখগহ্বর ছাড়াও নাসিকাগহ্বরটিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাসিকাগহ্বর সহযোগে অনুনাদিত এই যে স্বর সৃষ্টি, তাকে ন্যাজাল স্বর বলা হয়।

এইভাবে স্বরটিকে আরও উপরের দিকে ঠেলে তোলার চেষ্টা করতে থাকলে ক্রমশ নাসিকাগহ্বরের অধিকতর ব্যবহার অনুভবে আসবে এবং এক সময় স্বর প্রয়োগজনিত মৃদু ধাক্কা মস্তিষ্ক ছুঁয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। এই যে স্বর অনুনাদ সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে মস্তিষ্ক ছুঁয়ে যাওয়ার অনুভব দেয়, এটাই স্বরসীমার তীক্ষ্ণতম স্বর। এই স্বরকে হেড রেজিস্টার বলা হয়।

স্বরস্থান (Voice register)

এবার আমরা প্রধান স্বরস্থানগুলি আলোচনা করবো। ঊর্ধ্বদেহের যে অংশে স্বর প্রধানত অনুরণিত হয়, সেই অংশকেই স্বরস্থান বলে। স্বরস্থান প্রধানত তিনটি।

ক. **বক্ষস্থান** (Chest Register)—স্বরতন্ত্রী স্বর তৈরি হওয়ার সাথে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বাসনাশক্তি দ্বারা তাকে বক্ষস্থানে স্থাপন করতে হবে। আর অনুরণনের ফলে স্বরের ধরন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই স্বরকেই আবার বাসনা শক্তি দ্বারা শ্বাসনালি, স্বরতন্ত্রীর সরু রন্ধ্র (glottis) ও কণ্ঠনালির মধ্য দিয়ে মুখ বা মুখ ও নাসিকার সাহায্যে বাইরে বের করতে হবে।

খ. **কণ্ঠস্থান** (Throat Register) : স্বরতন্ত্রীতে স্বর তৈরি হওয়ার সাথে সাথে ভাব অনুযায়ী ইচ্ছাশক্তিতে তাকে কণ্ঠস্থানে স্থাপন করতে হবে। ফলে গলবিলে স্বর অনুরণিত হওয়ায় স্বরের ধরন পরিবর্তিত হবে। এটাই আবার ইচ্ছাশক্তিতে মুখ বা মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়ে বাইরে বের করতে হবে।

গ. **শিরস্থান** (Head Register)—স্বরতন্ত্রীতে স্বর সৃষ্টি হলেই তাকে ইচ্ছাশক্তিতে শিরস্থানে নিতে হবে। পরে নাসিকার পাশের গহ্বর ও নালিতে (sinus) স্বরের অনুরণনে স্বরের ধরন পালটে যাবে। এই পরিবর্তিত স্বর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মুখ বা মুখ ও নাক দিয়ে বাইরে বের করতে হবে।

এই মূল স্থানগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি গহ্বর আছে, যেগুলির ব্যবহারে স্বরের বৈচিত্র্য আসে। এই জায়গাগুলির ব্যবহারে স্বরের রং পরিবর্তিত হয়, বহুগুণ পরিবর্ধিত হয়। যে স্থানগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিভিন্ন স্বর উৎপন্ন হয় সেগুলির একটা তালিকা করা যাক।

১. শিরস্থান অনুনাদক (Upper head resonator)
২. বক্ষস্থান অনুনাদক (Thoracic resonator)
৩. নাসিক্য অনুনাদক (Nasal resonator)
৪. স্বরনালি অনুনাদক (Laryngeal resonator)
৫. পশ্চাৎ শিরস্থান অনুনাদক (Occipital resonator)
৬. পশ্চাৎ চোয়ালের স্থান অনুনাদক (Maxillary resonator)
৭. তলপেট অনুনাদক (Abdominal resonator)
৮. মেরুদণ্ড অনুনাদক (Spinal resonator)
৯. ঘাড় অনুনাদক (Neck resonator)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কয় ধরনের স্বর উৎপত্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ যাকে স্বরের বর্ণ (Manner of uttering) বলে, তা পাঁচ রকম। ক. অনুদাত্ত বা মন্দ্র স্বর (উদারা-Bass, contralto to female), খ. স্বরিত বা মধ্য (মুদারা-Baritone), গ. উদাত্ত বা তার (তারা-Tenor, soprano for female), ঘ. কম্পিত (Trembling), ঙ. ফিসফিস স্বর-(Whisper)

আবার মনোভাবের দিক থেকে দেখলে কণ্ঠস্বরের রঙ (Tone colour) দু'রকম। ক. আনন্দজনক মনোভাবের জন্য মুখ খোলা রেখে যে দীপ্তস্বর প্রয়োগ করা হয় তাকে শ্বেতস্বর (White Coloured Tone) বলা হয়। খ. বিষণ্ন মনোভাবের জন্য অপেক্ষাকৃত কম খোলা মুখে যে স্বর প্রযোগ করা হয় তাকে কৃষ্ণস্বর (Dark coloured tone) বলে।

স্বরস্থাপন (Placing the voice)

স্বর স্থাপনের দুই ধরনের পৃথক পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি অভিনেতাদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি গায়কদের জন্য। যদিও তাদের কাজ একেবারেই আলাদা। অনেক অপেরা গায়ক/গায়িকা যারা খুবই নামকরা, তারা কিন্তু লম্বা কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না। গলা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কেননা তারা তাদের স্বর স্থাপন করেছেন অপেরা গাইবার জন্য। কথা বলবার জন্য নয়।

শ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন স্বরস্থানে স্বর স্থাপন করাকে স্বর স্থাপনা বলে। মনের ইচ্ছে অনুযায়ী স্বর স্থাপনা করতে হয়। স্বর স্থাপনে নিশ্বাসকে বাধা দেয়ার জন্য স্বরতন্ত্রীতে যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হওয়া দরকার। সুস্বর সৃষ্টির জন্য উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক হবে, কষ্টকৃত হবে না। কোথাও ধাক্কা (jerk) থাকবে না। ঠিকভাবে শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন না হলে, স্বরের অনুরণন ঠিকভাবে না হলে, গলবিল ও ঘাড়ের পেশিতে অতিরিক্ত উত্তেজনা থাকলে স্বর কঠিন হয়ে ওঠে।

স্বরকল্পনা (Vocal Imagination)

সচেতন ও শরীরী চেষ্টায় স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে গুণজাত স্বর তৈরি হয়। এছাড়াও আরো দুটি পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে স্বরের গুণগত পরিবর্তন সম্ভব।

ক. অভিনেতার স্বর সম্পদশালী করার জন্য তাকে সব অস্বাভাবিক শব্দ তৈরি করা শিখতে হবে। এজন্য সব থেকে কাজের ব্যায়াম হলো সবধরনের প্রাকৃতিক শব্দ ও যান্ত্রিক শব্দ অনুকরণ করা। যেমন জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ, ঝর্ণার শব্দ, পাখির কিচিরমিচির, মোটর গাড়ির শব্দ ইত্যাদি। প্রথমে ভালো করে অনুকরণ করুন, তারপর কোনো সংলাপের অংশে ঐ শব্দগুলি সংলাপ বলতে বলতে করতে থাকুন। অর্থাৎ লিখিত শব্দগুলিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণময় করে তোলা।

খ. অভিনেতাকে তার স্বর বিভিন্ন স্থানে (register) নিয়ে স্বরসৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, আদতেই যেটা তার স্বাভাবিক স্বর নয়। অর্থাৎ স্বাভাবিকের থেকে উপরের অথবা নিচের স্বর সৃষ্টি করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে পদ্ধতিগতভাবে এবং ক্রমাগতভাবে স্বরকে অনভ্যস্ত স্বরস্থানে উপরে ওঠানো বা নিচে নামানো। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অনভ্যস্ত স্বরস্থানে কৃত্রিমভাবে স্বর সৃষ্টি করতে হবে। সেক্ষেত্রে সেই কৃত্রিমভাবে স্বরসৃষ্টি লুকোছাপা করার কোনো দরকার নেই।

কৃত্রিমভাবে অন্যান্য স্বরস্থানে স্বরসৃষ্টির ক্ষমতা অর্জনের আরেকটি পদ্ধতি হলো মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ নর-নারীর গলা নকল করে বলতে পারা। কিন্তু কোনো অভিনেতার নিজের স্বাভাবিক স্বরস্থান-এর নিচের থেকে স্বর তৈরির জন্য পদ্ধতিগতভাবে জোর প্রয়োগ করা উচিত নয়। যেমন খুব কঠিন, গম্ভীর, শক্ত এবং পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর অর্জন। এই ধরনের চেষ্টা খুবই ক্ষতিকর। এতে গলায় প্রদাহ ও জ্বালা শুরু হবে এবং কখনও কখনও স্থায়বিক বৈকল্যও উপস্থিত হতে পারে।

স্বরের ভিন্ন ব্যবহার (Vocal emploi)

কোনো অভিনেতা যদি গলার সমস্যায় ভুগতে থাকেন বা গলাকে পূর্ণাঙ্গ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহারে অসমর্থ হন অথবা ঐ সমস্যা যদি তাৎক্ষণিকভাবে দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে গলার এই সমস্যাকে লুকনোর জন্যে জোর প্রয়োগ করা উচিত নয়। অভিনেতার উচিত, নাটকের চরিত্র অনুযায়ী তার গলাটাকে জোর না দিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতিতে স্বরকে ব্যবস্থা করা (size up or manage) উচিত। এতে গলার সমস্যা প্রকট হয়ে ধরা পড়বে না এবং চরিত্রের দাবিও সংরক্ষিত হবে।

স্বরসৃষ্টির সূচনা (Attack of voice)

স্বর সৃষ্টির প্রথমে ঠিক সময়ের আগে তাড়াতাড়ি শব্দ তৈরির চেষ্টা, স্বরের প্রস্তুতির আগেই শ্বাস ত্যাগ, খুবই অলসভাবে স্বর বেরিয়ে যাওয়া এবং যাতে হঠাৎ কোনো আওয়াজ তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বরযন্ত্র প্রস্তুত হওয়ার আগেই অল্প শ্বাস বেরিয়ে গেলে ফিসফিস স্বরের চেয়ে কিছুটা উঁচু স্বর তৈরি হয় মাত্র। তাতে উচ্চারণ স্পষ্টতা বা জোর আসে না। গলবিলের পেশি শক্ত হলে ও মুখ বন্ধ করে শুরু করলে দ্রুত ধ্বনি তৈরি হয়। এতে বক্তার স্বর সম্পর্কে অনিশ্চয়তাবোধ কাজ করে।

এই ত্রুটি দূর করার জন্য স্বাভাবিক স্বর সম্পর্কে ঠিক করে জানা দরকার। স্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি হওয়ার সময়ে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ স্বরের পরিসর সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। উচ্চ, মধ্য ও নিম্নস্বর অনুযায়ী স্বরযন্ত্র ও স্বরস্থানের গতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। আর সেই জন্যে স্বর সৃষ্টির সূচনায় গলবিলের খোলা ও শিথিল অবস্থা, স্বরযন্ত্রের স্বাভাবিকতা এবং চিবুক ও চোয়ালের নমনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ডায়াফ্রাম ও উদরের পেশি দিয়ে শ্বাস-নিশ্বাস শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ শ্বাসনিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ তথা স্বরতন্ত্রীর কম্পন ধারণের উপর প্রধানত বিভিন্ন স্বর (notes) সৃষ্টির সূচনা নির্ভর করে। উচ্চস্বর তৈরির সময় গলবিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চোয়ালের অবস্থান ঘটাতে হবে। সাধারণভাবে হাই (yawn) তোলার মতন চোয়ালের অবস্থান হবে। এ কারণে গলবিল বিস্তৃত এবং গলবিলের পেশির অবাঞ্ছিত উত্তেজনা দূর হয়।

স্বরের ভিত্তিমূল (Voice base)

কোনো স্বরস্থানের ব্যবহারের অর্থ ধরে নেয়া হয় যে সেখানে বাতাসের যোগান আছে এবং এই বাতাসকে চাপ দেয়ার অর্থ হলো যে তার একটা ভিত্তিমূল আছে। একজন অভিনেতাকে অবশ্যই সচেতনভাবে বাতাসের যোগানের ভিত্তিমূল খুঁজে বের করা শিখতে হবে। স্বরের এই ভিত্তি এইভাবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে :

ক. তলপেটের দেয়ালে সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতি সাধারণ ইউরোপীয় অভিনেতারাই ব্যবহার করে থাকেন। যদিও তাদের অনেকেই এই মাংসপেশি বিস্তার চর্চার সত্যিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নন। অপেরা গায়ক-গায়িকারা প্রায়শই এই ভিত্তিমূলে (base) হাত দুটি কোনাকুনিভাবে তলপেটের উপর রেখে আবার চালু করেন। মনে হয় যে একটা রুমাল ধরে রাখা আছে এবং হাতের সামনে দিয়ে নিচের পাঁজরে চাপ দিচ্ছে।

খ. এবারের পদ্ধতিটি চীনা ধ্রুপদী নাট্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিনেতা তার কোমর একটা চওড়া বেল্টের সাহায্যে খুব শক্ত করে বাঁধে। যখন সে তলপেট ও ঊর্ধ্ববক্ষপ্রদেশের সাহায্যে সম্পূর্ণ শ্বাসগ্রহণ করে, এই বেল্ট তখন তলপেটের পেশিতে একরকম চাপ তৈরি ক'রে বাতাস যোগানের (air column) একটা ভিত্তি তৈরি করে।

গ. তলপেট এবং ঊর্ধ্ব বক্ষগহ্বরের সাহায্যে সম্পূর্ণ শ্বাস গ্রহণের পর, পেটের পেশিগুলো চাপ খায় এবং আপনা থেকেই বাতাসকে উপরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। নিচের পাঁজরগুলিকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়া হয় এবং এইভাবেই বাতাস যোগানের আর একটা ভিত্তি (base) অর্জন সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ শ্বাসগ্রহণের আগেই তলপেটের পেশিতে চাপ দিলে সেটা একটা সাধারণ ভুল হিসেবে পরিগণিত হবে। ফলে দেখা যাবে যে শুধু ঊর্ধ্ব বক্ষগহ্বরের শ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

গ্রহণ হয়েছে এক্ষেত্রে।

এখানে তলপেটের পেশির সঙ্কোচনের সময় বেশি বাতাস জমিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি এ কারণে যে এর ফলে স্বরযন্ত্র বন্ধ থাকে। যদি তলপেটের পেশি যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে এক ধরনের মাথা ঝিমঝিম করার অনুভূতি হতে পারে।

স্বরযন্ত্রের ফাঁক (Opening of larynx)

কথা বলার সময়ে এবং শ্বাসগ্রহণকালে স্বরযন্ত্র খোলার ব্যাপারে একটু বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। বন্ধ স্বরযন্ত্র দরকারি বাতাস বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়। আর এটাও বোঝা যায় যে অভিনেতা স্বরের সঠিক ব্যবহার করতে পারছেন না।

স্বরযন্ত্র বন্ধ থাকলে

ক. স্বর হবে নিরস ও একঘেয়ে;

খ. গলায় ঠিক ঠিক স্বরযন্ত্রের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে;

গ. শ্বাসগ্রহণকালে সামান্য শব্দ (Noise) শোনা যাবে।

ঘ. স্বরযন্ত্রের উঁচু জায়গা (Adam's apple) আরো উপরে উঠবে (যেমন গলধকরণের সময় স্বরযন্ত্র বন্ধ থাকবে এবং অ্যাডামস্ এ্যাপেল উঠে আসবে)।

ঙ. ঘাড়ের পিছনের পেশি সঙ্কুচিত হবে;

চ. থুতনির নিচের পেশিও সঙ্কুচিত হবে (থুতনির নিচে বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে এবং নিচের ঠোঁটের নিচে তর্জনি রেখে এটা পরীক্ষা করে দেখা যায়);

ছ. নিচের চোয়াল বেশি সামনে অথবা বেশি পিছনে থাকে।

স্বরযন্ত্র সবসময় খোলা থাকে যখন বোঝা যায় মুখের পিছন দিকে অনেক খোলা জায়গা রয়েছে। (যেমন হাই তোলার (yawn) মতো মুখ খোলা)।

স্বরযন্ত্র বন্ধ থাকা একটা খারাপ অভ্যাস, যা নাটকের স্কুলের ছেলেরা করে থাকে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১. যে ছাত্রটি অভিনয় করবে সে শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ শেখার আগেই সংলাপ ও উচ্চারণ চর্চা করে। সে শুধু উচ্চারণ ও সংলাপ শেখার মধ্য দিয়েই কার্যকরী স্বরের ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং গৃহীত শ্বাসের পরিমিত ব্যবহারের কারণে স্বরযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।

২. ছাত্রটিকে শ্বাস নিতে বলা হয় এবং তারপর জোরে গুনতে বলা হয়। যত বেশি সে গুনতে পারবে ততো বেশি তাকে বাহবা দেওয়া হয় শ্বাসের পরিমিত ব্যবহার করার ক্ষমতার জন্য। এটি একটি অমার্জনীয় ত্রুটি। কারণ, আরো সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগোবার জন্য ছাত্রটি তার স্বরযন্ত্র বন্ধ করে ফেলে। এইভাবে সে তার স্বরের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অন্যদিকে খুব গভীরভাবে শ্বাস নেয়া প্রয়োজনীয় এবং শ্বাস ধরে রাখার চেষ্টা করা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি শব্দ যেন বাতাসের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেয়া হয়। বিশেষ করে স্বরবর্ণগুলিকে। যত্ন অবশ্যই নিতে হবে। শব্দের মধ্যে বাতাস যেন অবশ্যই থাকে।

৩. অসম্পূর্ণ শ্বাস, যেটা কখনও আপাতদৃষ্টে মনে হয় ঠিকই আছে। প্রায়শই ছাত্ররা শ্বাস নিতে গিয়ে তলপেটের বিস্তার করে, কিন্তু আসলে দেখা যায় সেটা শুধু উর্ধ্ববক্ষগহ্বরের শ্বাস গ্রহণ করা হয়েছে।

চীনা ডাক্তার লিং স্বরযন্ত্র খোলার ব্যাপারে ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করেছেন। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সামনের দিকে দাঁড়াতে হবে। নিচের চোয়াল সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করে থাকবে এবং তর্জনী দিয়ে নিচের ঠোঁটের নিচে ঠেক্ দিয়ে রাখতে হবে, যাতে নিচের চোয়াল ঝুঁকে না পড়ে। উপরের চোয়াল ও চোখের ভ্রু উপরে টেনে তুলুন এবং সেই সাথে কপালে ভাঁজ ফেলুন। যাতে এই অনুভূতি হয় যে হাই তোলার মতো কপাল ও নাকের মধ্যবর্তী স্থান প্রসারিত হয়েছে। যখন মাথার ঠিক ওপরের ও পিছনের এবং ঘাড়ের পেছনের দিকের পেশি সামান্য সঙ্কুচিত হয়েছে। অবশেষে স্বরকে বেরুতে দিন। এই পুরো ব্যায়ামের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন থুত্নির নিচের পেশি নরম ও মুক্ত থাকে এবং থুত্নিকে ঠেক্ দেয়ার জন্য যেন কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়। এই ব্যায়াম করতে গিয়ে যে ভুলগুলি সাধারণত হয়ে থাকে সেগুলো হলো থুত্নি এবং ঘাড়ের সামনের দিকের পেশি সংকোচনের সময়, নিচের চোয়ালের ভুল অবস্থান (হয়তো অনেক পেছনে স্থাপন করা হলো), মাথার পেশি নরম করা এবং উপরের চোয়াল উঠানোর বদলে নিচের চোয়াল ছেড়ে দেয়া (drop)। এই ভুলগুলি শুধরে ঠিকমতো স্বরযন্ত্রের মুখ খুলতে পারলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হবে।

ধ্বনির পরিসর

অনেক সময় স্বাভাবিকের থেকে জোরে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে। যেমন আদেশ করা, বক্তৃতা করা ইত্যাদি। তখন উপায় স্বরপ্রাবল্য (Intensity) বাড়িয়ে দেয়া। স্বরের প্রাবল্য বাড়াবার জন্য নিশ্বাসের সময় প্রয়োজনীয় শক্তি (energy) প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে ধ্বনিতরঙ্গের পরিসর বেড়ে যাবে। অতিরিক্ত জোর দিয়ে চিৎকার করে স্বরের জোর বাড়ানো যায় না। এতে স্বরতন্ত্রীর ক্ষতি হয়।

কণ্ঠস্বরের অবস্থা যাই হোক না কেন, স্বরসাধনার দ্বারা স্বরকে পরিশীলিত করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরের মাধুর্য বেড়ে যায় এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্বরসাধনায় নিশ্বাস ধরে রাখার চেষ্টা এবং স্বরপ্রাবল্য বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। **ক.** ফুসফুস থেকে বাতাস আসা, **খ.** সে বাতাসে স্বরতন্ত্রীর কম্পন সৃষ্টি হওয়া, **গ.** উঠে আসা স্বর নাক, মুখ, গলা ও বুকে অনুরণিত হওয়া এবং **ঘ.** দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নাসিকা দিয়ে ঠিকমতো ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিশ্বাস ধরে রাখা ও স্বরপ্রাবল্য বৃদ্ধির ব্যায়াম

১. খোলা মুখে শ্বাস নিয়ে নিশ্বাস ধরে রেখে 'আ'ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ হাত দিয়ে পেটে চাপ দিলে স্বরের শক্তি বেড়ে যাবে। এভাবে তিন বার আলাদা আলাদা দম নিয়ে 'আ'-ধ্বনি উচ্চারণ করুন। পরে এক নিশ্বাসে থেমে থেমে তিনবার 'আ'ধ্বনি উচ্চারণ করুন।

২. সাধারণ কথা বলার মতো স্বরে 'আ'ধ্বনি উচ্চারণ করুন। ক্রমে জোরে উচ্চারণ করুন এবং আস্তে আস্তে স্বরকে কমিয়ে আগের অবস্থায় আনুন।

৩. অ.আ.ই.উ.এ.ও.এ্যা-কে ক্রমে স্বরের প্রাবল্য বাড়িয়ে বলুন এবং কমিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসুন।

৪. স্বরটি টানা বলুন। ক্রমে প্রাবল্য বাড়ান (Loud), আবার স্বরটি ধরে রেখে ক্রমে প্রাবল্য কমান (Low), স্বরটি উচ্চারণকালে Pitch-এর পরিবর্তন করবেন না।

৫. খোলা মুখে শ্বাস নিয়ে নিশ্বাস ধরে রেখে ক্রমে স্বরপ্রাবল্য বাড়িয়ে উচ্চারণ করুন—কোথায়, কে, আমি যাব, বেরিয়ে যাও, বলতে হবে।

৬. শ্বাস ধরে রেখে একসঙ্গে এক এক লাইন বলবেন। অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু শব্দ বলে শ্বাস রক্ষার চেষ্টা করুন।

ক. অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা। অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া। অপরাধ ক্ষম অ গো অবগো অব্যয়া॥

ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল

খ. ঊর্ধ্ববাহু যেন রাহু চন্দ্রসূর্য পাড়িছে। লম্ফ-ঝম্প ভূমিকম্প নাগকূর্ম নাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি: ঢালি লক্ষ দেহ পুড়িছে। ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণুরেণু উড়িছে॥

ভারতচন্দ্র, দক্ষযজ্ঞনাশ

গ. ঝঞ্ঝণার ঝঞ্ঝণী বিদ্যুৎ-চকচকি। হড়্মড়ি মেঘের ভেকের মক্মকি॥
ঝড়্ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝর্ঝরি। চারিদিকে তরঙ্গ জলের তর্তরি॥

ভারতচন্দ্র, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ঘ. মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ভম্ভম্ ভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট্ সঙ্ঘট্ট্য গঙ্গা। ছলছল্ টলটল্ কলকল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ন গাজে। দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্ধক্ ধক্ধক্ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥

ভারতচন্দ্র : শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, অন্নদামঙ্গল

স্বর স্তর (Pitch)

স্বর কতটা উপরে উঠছে এবং কতটুকু নিচুতে নামছে তারই পরিমাপকে পিচ্ বলে। স্বরের তীব্রতা ও গম্ভীরতার পার্থক্যের মধ্য থেকেই পিচ বোঝা যায়।

গলার পেশি মুক্ত রেখে পূর্ণ শ্বাস নিয়ে সহজভাবে ও অনায়াসে 'অ'ধ্বনি সহযোগে স্বাভাবিক স্বর প্রকাশ করতে হবে। ক্রমশ একটি একটি করে স্বরের ধাপ নিচে নামাতে হবে। যেখানে নামলে মুখবিকৃতি ও শক্তভাব ছাড়া স্বরটি পরিষ্কার শোনার উপযুক্ত করে তোলা যাবে, সেখানেই থামতে হবে। এই স্বরটিই হবে সর্বনিম্ন স্বর। সেখান থেকে আবার একটি একটি করে স্বর ক্রমে উঁচুতে তুলতে হবে। মুখবিকৃতি না ঘটিয়েও অনায়াসে যে সর্বোচ্চ স্বরটি কণ্ঠে ধ্বনিত হবে সেখানে থামতে হবে। ঐ সর্বনিম্ন স্বর থেকে সর্বোচ্চ স্বর পর্যন্তই স্বরস্তরের বিস্তৃতি ধরে নিতে হবে। এর মধ্যে থেকে স্বাভাবিক স্বরটি বেছে নিতে হবে। ঐ স্বাভাবিক স্বরকে সুরের ভিত্তি ধরে স্বরসাধনা করতে হবে। চর্চার মধ্য দিয়ে ঐ স্বরকে পরিষ্কার করে একটা বিশেষ মানে নিতে হবে। যেকোন সময় ঐ স্বর যেন সঙ্গীত যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই শুদ্ধভাবে কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে।

সুরেলা স্বর (Voice melody)

স্বর যদি সাধা হয় এবং সুরের রেশের সাথে উচ্চারিত হয় তবেই সেই স্বর সুরেলা স্বর। পিচ বিস্তৃতির মধ্য থেকে স্বাভাবিক স্বরটি খুঁজে পাওয়া গেলে সেটিই মুদারার 'সা' হবে। আমাদের সঙ্গীতে সাতটি শুদ্ধস্বর ও পাঁচটি বিকৃতস্বর নিয়ে একটি স্বরগ্রামে মোট বারোটি স্বরের স্তর ঠিক করা হয়েছে। অভিনেতাদের কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা করা দরকার। সঙ্গীত, সুর ও স্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে অভিনেতাদের। সুরজ্ঞান না থাকলে একটি দৃশ্যে অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয়ের সময় কণ্ঠস্বরের স্তর (scale) ঠিক রেখে সংলাপ শুরু করা সম্ভব নয়। কণ্ঠস্বর সমপর্যায়ে রেখে অর্থাৎ আগের অভিনেতা যে স্তরে সংলাপ ছাড়বে পরের অভিনেতাকে সেই স্বর বজায় রেখে সংলাপ শুরু করতে হবে। পরে সংলাপের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন কণ্ঠভঙ্গির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। তবে এই পদ্ধতি সর্বগ্রাহ্য নয় এবং সব সময় প্রয়োজনে নাও লাগতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরের রঙ, রাগ ও ভাব

মনোভাবের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মনোভাবের বৈচিত্র্যে কণ্ঠস্বর কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে, কখনও নিচু পর্দায় নামে। কখনও তার স্থায়িত্ব বাড়ে, কখনও কমে। এর ফলে আমরা কথা না শুনে স্বর শুনেও মনোভাব বুঝতে পারি। এটা নিয়ন্ত্রিত হয় স্বরস্তর ও বলার গতিবেগ থেকে। অতএব বক্তা ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরস্তর ও গতিবেগও নির্ধারণ করবেন। মানুষের মনের ভাব এই বিভিন্ন ধরন স্বরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যেমন :

ক. হতাশা, বিষাদ, বিমর্ষতা মানুষের কাজকর্মে যেমন মন্থরতা আনে ঠিক তেমনি কথার গতিবেগও হয় মন্থর এবং স্বর স্তরও নিচে নেমে আসে।

খ. গম্ভীর ও ধীর ভাবের ক্ষেত্রে গতিবেগ আরো কমে—স্বরস্তর প্রায় ভিত্তিমূলে নেমে আসে।

গ. আনন্দ, বিস্ময়, উল্লাস, সুজাগ্রত অহংবোধ, সাফল্যের গর্ব, সাদর সম্ভাষণের উত্তাপে মানুষের হৃদস্পন্দন যেমন বেড়ে যায়—কথা বলার গতিবেগও বেড়ে যায় তেমন। স্বরস্তরও হয় উন্নত।

ঘ. ঝগড়া, ভর্ৎসনা, স্পর্ধা প্রকাশ, অবজ্ঞা প্রদর্শন, আলোড়ন বা ক্রোধের ভাব মানুষকে উত্তেজিত করে—ব্যবহারে দ্রুততা দেখা যায়। এজন্য এমন উত্তেজিত ক্ষণে উচ্চারণের গতিবেগ আরও বাড়ে, কণ্ঠের কোমলতা দূর হয়, স্বরস্তর শুধু উঁচুই হয় না, তাতে প্রাবল্যও দেখা দেয়।

ঙ. অসুস্থতা, উদ্বেগ, নেশাগ্রস্ততা, ক্লান্তি ইত্যাদি উদ্যমশূন্যতা বোঝাতে স্বর মৃদু হয়। স্বরস্তর হয় নিচু, গতিবেগ অতি মন্থর হয়ে পড়ে।

চ. ভয় ও আতংকে স্বরের গতিবেগ বাড়ে। স্বরস্তর নিম্নের কাছাকাছি এসে যায়। কম্পিত হতে থাকে।

ছ. স্নেহ বা ভালোবাসার প্রকাশে, লজ্জা বোঝাতে স্বরের গতি হয় মধ্যম। স্বরস্তর প্রায় ভিত্তিমূলে নেমে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রক্রিয়া

শুদ্ধ, পরিষ্কার ও স্পষ্ট উচ্চারণের উপরই অভিনেতার সবার আগে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। উচ্চারণ ও স্বর প্রক্ষেপণ এমন হওয়া উচিত যেন মঞ্চ থেকে প্রক্ষেপিত আওয়াজ দর্শকরা স্পষ্ট শুনতে পান। কথা যেন জড়িয়ে না যায়। উচ্চারণ যেন একঘেয়ে না হয়। বৈচিত্র যেন থাকে। অভিনেতা তার অভিনয় রূপে, রঙে, রসে, প্রাণে ভরপুর করে তোলেন শব্দের উচ্চারণ বৈচিত্র্যে। অভিব্যক্তি অনুযায়ী শব্দের উচ্চারণ পালটে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে দ্রুত উচ্চারণের ফলে ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে পাশের একটি ধ্বনির উচ্চারণ মিশে যায়। উচ্চারণ তখন হয় অস্পষ্ট।

যা হোক অভিনয়ের উচ্চারণ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা বাংলা বর্ণ এবং বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ে কথা বলবো।

গলা, জিভ, ঠোঁট, দাঁত, চোয়াল ও তালু এগুলি হচ্ছে কথা বলার যন্ত্র বা বাগ্‌যন্ত্র। এই ধ্বনি লিখিত হয় বর্ণে। বর্ণে বর্ণে হয় অক্ষর। স্বরকে বাদ দিয়ে উচ্চারণ হতে পারে না। উচ্চারণের যন্ত্র বলতে যে যে অঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাদের কাজ অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সক্রিয় (Active) এবং সহায়ক (Passive)। জিভ, দাঁত, অধর বা নিচের ঠোঁট হলো সক্রিয়; অন্য অঙ্গগুলি (ওষ্ঠ, দন্ত, দন্তমূল, মূর্ধা, কঠিন তালু, কোমল তালু) সহায়কের ভূমিকা নেয়।

আলজিহ্বা কখনো সক্রিয় কখনো সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সক্রিয় অঙ্গগুলি কখনো পরস্পর নানাভাবে সংযুক্ত হয়ে ধ্বনির নির্গমন পথে যথার্থ বাধার সৃষ্টি করে, কখনো-বা নানা অবস্থানে উঠে এবং নেমে গিয়ে পথটির আকার-আয়তনের পরিবর্তন ঘটায়। এই বাধা নানা রকমের হয়ে থাকে। স্বরযন্ত্র থেকে শুরু করে অধর ওষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত মুখগহ্বরের নানা স্থানে বাধার সৃষ্টি হয়। এক ধরনের বাধা সৃষ্টি হয় স্বরতন্ত্রীতে। এটা ঠিক বাধা নয়। স্বরতন্ত্রীদ্বয়, পরস্পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকটবর্তী হয়ে বায়ুর নির্গমন মুখে এসে দাঁড়ালে স্বরতন্ত্রীতে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার ফলে ধ্বনি কিছুটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই ক্রিয়া যাদের ক্ষেত্রে হয় সেই বর্ণগুলির ধ্বনিকে ঘোষধ্বনি বলে গ.জ.ড.দ.ব. ঘ.ঝ.ঢ.ধ.ভ। যেসব বর্ণের উচ্চারণকালে এই ক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় না, অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীরা পথ আগলাবার চেষ্টা করে না, সেই সব বর্ণের ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে : ক. চ ট ত প খ.ছ.ঠ.থ.ফ। কানে আঙুল দিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলে স্বরতন্ত্রীর কম্পনের এই রহস্যটি বোঝা যাবে।

এবার আমরা বাংলা ভাষায় যতগুলি বর্ণ আছে। স্বরবর্ণ (Vowels) ও ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants) আছে, তাদের উচ্চারণ স্থান-এর তালিকা করবো। স্বরবর্ণ মোট ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। আমরা জানি যেসব ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজে নিজে পরিষ্কার উচ্চারিত হতে পারে তাদের স্বরধ্বনি বলে। অযুক্তধ্বনি—যেমন অ.আ.ই.ঈ.উ.ঊ.ঋ.এ.ও। আর আছে যুক্তধ্বনি বা দ্বিস্বর (Diphthong)-দুটো স্বরধ্বনি মিলে এই ধ্বনির উৎপত্তি। এক স্বরে উচ্চারণটা শুরু হওয়ার পরে আবার অন্য স্বরে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। যুক্তধ্বনির উচ্চারণ দ্রুত হয় বলে তাকে একটি স্বরধ্বনির মতোই মনে হয়।

যেমন—ঐ=ও+ই, ঔ=ও+উ, বাংলায় প্রায় পঁচিশটি দ্বিস্বর বা যুক্তধ্বনি আছে। যেমন, দাউ দাউ-আ+উ, যায়-আ+এ, সওয়া বা সয়া-অ+আ বা ও+আ, নয়-অ+এ, পাই-আ+ই, গাও-আ+ও, নেয়- অ্যা+এ, ম্যাও-অ্যা+ও, ইয়ার-ই+আ, মিউ-ই+উ, নিয়ে -ই+এ, নিও-ই+ও, জুয়া-উ+আ, দুই-উ+ই, নুয়ে-উ+এ, কুয়ো-উ+ও, খেয়া-এ+আ, নেই-এ+ই, কেউ-এ+উ, যেও-এ+ও, মোয়া-ও+আ, দই-ও+ই, রয়ে-ও+এ ইত্যাদি।

এবার আমরা ব্যঞ্জন-ধ্বনির কথা বলবো। যে ধ্বনি নিজে পরিষ্কার উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে উচ্চারণ করতে স্বরধ্বনির সাহায্য নিতে হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ব্যঞ্জনধ্বনিকে আবার কয়েকভাবে ভাগ করা যায়।

যেমন বর্গীয় বর্ণ-

ক,খ,গ,ঘ,ঙ—ক বর্গ, কণ্ঠ্য বর্ণ

চ,ছ,জ,ঝ,ঞ—চ বর্গ, তালব্য বর্ণ

ট,ঠ,ড,ঢ,ণ—ব বর্গ, মূর্ধন্য বর্ণ

ত,থ,দ,ধ,ন—ত বর্গ, দন্ত্য বর্ণ

প,ফ,ব,ভ,ম—প বর্গ-ওষ্ঠ্য বর্ণ

অন্তঃস্থ (Spirants) Nzবর্ণ-এ জাতীয় বর্ণ বর্গীয় ও উষ্মবর্ণের মাঝে থাকে বলে অন্তঃস্থবর্ণ নামেই পরিচিত। যেমন য,র,ল,ব। এদের মধ্যে আবার য,ব অর্ধস্বর (Semivowel)। অনেকটা 'ব' W-এর মতো উচ্চারণ এবং 'য' Y-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে। র,ল হলো তরলস্বর বা Liquids।

উষ্ম বর্ণ—যে সব বর্ণের উচ্চারণের সময় নিশ্বাস বিলম্বিত হয় তাদের উষ্ম বর্ণ বলে। শ,ষ,স এবং হ হলো উষ্মবর্ণ, শ,ষ,স উচ্চারণে শিস ধ্বনির সঙ্গে কিছুটা মিল থাকে বলে একে **শিস ধ্বনি**ও (Sibilarts) বলা হয়।

অযোগবাহ বর্ণ—ং এবং ঃ বর্ণ গণনার মধ্যে এদের উল্লেখ নেই বলে এরা 'অযোগ'। কিন্তু ণত্ব ও ষত্ব বিধান কাজে এরা সংযুক্ত বলে এরা 'বাহ'; কাজেই এদের অযোগবাহ (পরাশ্রিত) বর্ণ বলা হয়।

বর্গীয় বর্ণগুলি মুখগহ্বরের বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার স্পর্শ এবং ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শে উচ্চারণ হয় বলে এদেরকে স্পর্শ বর্ণও বলা হয়ে থাকে।

ঙ,ঞ,ণ,ন,ম—এদেরকে **নাসিক্য বর্ণ** বলা হয়। ং ও ঁ **অনুনাসিক বর্ণ**। ঃ আশ্রয় স্থানবাগী। কারণ যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে ঃ উচ্চারিত হয় সেই স্বরের উচ্চারণস্থানই বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ স্থান।

আবার বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য না থাকায় এদেরকে **অঘোষ বর্ণ** (Unvoiced) বলে। শ,ষ,স এরাও অঘোষ বর্ণ। আবার বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য আছে বলে এদের **ঘোষ বর্ণ** বা নাদ বর্ণ (Voiced) বলা হয়। ঘোষ বর্ণের উচ্চারণে 'হ' ধ্বনির মিশ্রণ ঘটে থাকে। য,র,ল,ব,হ—এরাও ঘোষ বর্ণের।

যে সব বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা বায়ু বা নিশ্বাসের আধিক্য কম তাদের **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলা হয়। যেমন বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ, ক গ, চ জ, ট, ড, ত দ, প ব। আর যেসব বর্ণের উচ্চারণে প্রাণের বা বাতাসের আধিক্য আছে তাদেরকে **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলে, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণ।

জিহ্বার অগ্রভাগ কাঁপিয়ে দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয় বলে 'র'কে **কম্পনজাত ধ্বনি** (Trilled) বলে। জিভের সামনে দিয়ে দাঁতের গোড়া ছুঁয়ে জিভের দু'পাশ দিয়ে বাতাস বের করে উচ্চারণ করা হয় বলে 'ল'কে **পার্শ্বিক ধ্বনি** (Lateral) বলে।

জিভের সামনের দিক উলটে দিয়ে তার নিচে দিয়ে উপরের দন্তমূলে তাড়ন (আঘাত) করে ড়, ঢ় উচ্চারণ করা হয় বলে এদের **তাড়নজাত ধ্বনি** (Flapped) বলে।

এবার এতক্ষণ যে ধ্বনি ও বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলিকে একটি ছকে আমরা সাজিয়ে ফেলতে পারি। এই ছকটি এক নজরে দেখলেই বর্ণের উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর বর্ণের উচ্চারণ স্থান

স্বর বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	বর্ণের নাম
অ, আ	কণ্ঠ থেকে	কণ্ঠ্য বর্ণ
ই, ঈ	তালু থেকে	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ	ওষ্ঠ থেকে	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঋ	মূর্ধা থেকে	মূর্ধন্য বর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ+তালু থেকে	কণ্ঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ+ওষ্ঠ থেকে	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ

উচ্চারণের দিক থেকে স্বরবর্ণ দুই প্রকার। ই, ঈ, এ, আ এবং অ্যা ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা সামনের দিকে (দাঁতের দিকে) পাঠিয়ে উচ্চারণ করা হয় বলে এদেরকে

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ স্থান

বৈশিষ্ট্য / নাম	অঘোষ (Unvoiced)		ঘোষ (Voiced)		নাসিক্য	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ প্রক্রিয়া	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহপ্রাণ				
ক-বর্গ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	জিহ্বা মূল	কোমল তালুর সঙ্গে জিহ্বামূলের স্পর্শ	কণ্ঠ্য বর্ণ
চ-বর্গ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	অগ্র তালু	তালুর সঙ্গে জিহ্বার অগ্রভাগের ঘর্ষণ	তালব্য বর্ণ
ট-বর্গ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	মূর্ধা	জিহ্বার ডগার তলদেশ দিয়ে মূর্ধা স্পর্শ	
ত-বর্গ	ত	থ	দ	ধ	ন	দন্ত	দন্তের সঙ্গে জিহ্বার ডগা স্পর্শ	দন্ত্য বর্ণ
প-বর্গ	প	ফ	ব	ভ	ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠাধরের স্পর্শ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থবর্গ			য,র,ল,ব					
উষ্ম বর্ণ	শ					অগ্র তালু	তালুর সঙ্গে জিহ্বার পাতা স্পর্শ	তালব্য বর্ণ
	ষ					মূর্ধা	মূর্ধার সঙ্গে জিহ্বার ডগা স্পর্শ	মূর্ধণ্য বর্ণ
	স					দন্ত মূল	দন্তমূলের সঙ্গে জিহ্বার ডগা স্পর্শ	দন্ত্য বর্ণ
				হ		কণ্ঠ	কোমল তালু সঙ্কুচিত করে বেগে উষ্ণ শ্বাস নির্গমন	কণ্ঠ্য বর্ণ
তাড়নজাত বর্ণ			ড়	ঢ়		মূর্ধা	জিহ্বার ডগার তলদেশ দিয়ে মূর্ধায় দ্রুত আঘাত	মূর্ধণ্য বর্ণ
	ৎ					দন্ত মূল	দন্তমূলের সঙ্গে জিহ্বার ডগা স্পর্শ	
অযোগবাহ (পরাশ্রয়ী)		ঃ			ং			

সামনের দিকের স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি বলা হয়। উ, ঊ, ও, অ, এবং কখনো কখনো 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে পিছনের দিকে অর্থাৎ কণ্ঠের দিকে আকর্ষণের ফলে এদেরকে পেছনের দিকের স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি বলা হয়।

একটি বর্ণের উচ্চারণগত যে প্রক্রিয়া, সেটির যথাযথ পালনেই তা সঠিক ধ্বনিত হতে পারে। যেমন 'ধ'। বাধার প্রকৃতি অনুযায়ী এটি স্পৃষ্টধ্বনি এবং ঘোষধ্বনিও বটে। স্থান অনুযায়ী 'দন্ত'। এবং আরো একটি পরিচয় হলো এটি 'মহাপ্রাণ'। অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর চাপ কিছু বেশি দরকার। কাজেই সামনের অংশ দাঁতের পেছনে পূর্ণ বাধার সৃষ্টি করবে যতক্ষণ না বিস্ফোরণযোগ্য বায়ুচাপ সৃষ্টি হয়, একই সঙ্গে স্বরতন্ত্রীদ্বয় পরস্পর যুক্ত হয়ে ও মুক্ত হয়ে বাড়তি অনুরণন সৃষ্টি করবে, অতঃপর বাধার পর হঠাৎ মুক্ত হয়ে ঠিকভাবে 'ধ' উচ্চারিত হবে।

তেমনি ধরা যাক 'ও'। জিভ মধ্য-উচ্চ পর্যায়ে উঠিয়ে রেখে, পশ্চাৎভাগে এনে, ঠোঁট দুটি গোল করে, মুখগহ্বর অর্ধসংবৃত অবস্থায় রাখলে তবে যথার্থ ও-ধ্বনি শোনা যাবে।

এবার উচ্চারণে চলিত কিছু ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। কেন এই ত্রুটিগুলি হয়—

১. শিথিল অভ্যাসের জন্য। এক্ষেত্রে উচ্চারণকারী যথাযথ অক্ষম নয়, কিন্তু অভ্যাসের কারণে ভুল উচ্চারণ করে।
২. উচ্চারক অঙ্গদ্বয়ের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারার কারণে।
৩. ভুল উচ্চারণ নিজের কানে ধরতে না পারা, হয়তো উচ্চারণ প্রক্রিয়াটি সে যথাযথ পালনে সক্ষম, কিন্তু সেটি কখন ঠিক হচ্ছে, কখন ভুল হচ্ছে ধরতে না পারা।
৪. কথা খেয়ে ফেলা বা বাদ পড়ে যাওয়া।
৫. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য না করা।
৬. , ন, ণ, ম, ইত্যাদি নাসিক্য বর্ণের উচ্চারণে ত্রুটি।
৭. হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে পার্থক্য না করা।
৮. 'শ', 'ষ' ও 'স'-এর উচ্চারণে গোলমাল।
৯. নাসিক্য ধ্বনির অতিরিক্ত ব্যবহার।
১০. বিশেষ কয়েকটি যুক্তাক্ষর উচ্চারণে অপারগতা।
১১. চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণের অভ্যাস।
১২. অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন উচ্চারণ।
১৩. 'র'-এর জায়গায় 'ড়' এবং 'ড়'-এর জায়গায় 'র' উচ্চারণ করা।
১৪. 'অ'-এর সঠিক উচ্চারণে অজ্ঞতা।
১৫. 'র' ফলা (্র), 'রেফ' (র্) ও ঋ-কারের (ৃ) উচ্চারণ ঠিক না করা।
১৬. ওষ্ঠ বর্ণের বিশেষ করে 'ফ'-এর উচ্চারণ ভুল করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭. দন্তমূলীয় উচ্চারণের পরিবর্তে ঠোঁট দুটো গোল করে ছোট করে বলার অভ্যাস।
১৮. অতি দ্রুত ধাক্কা দিয়ে উচ্চারণ।

এখন আমরা দেখে নিই কেন এই ভুলগুলো হচ্ছে।

- উচ্চারণের সময় অসাবধানতা, অমনোযোগ ও অবহেলার কারণে উচ্চারণ ভুল হয়।
- জিভের জড়তা এবং জিভ ও ঠোঁটের অসতর্ক ব্যবহারে উচ্চারণ ভুল হয়।
- তাড়াতাড়ি কথা বললে উচ্চারণ অপরিষ্কার হয়।
- মুখের 'হা' অস্বাভাবিক রকম ছোট, সে কারণে।
- না জানার কারণে উচ্চারণ ভুল হয়।
- আঞ্চলিক প্রভাবে উচ্চারণ ভুল হয়।
- চোয়াল শক্ত করে উচ্চারণ করলে ভুল হতে পারে।
- সঠিক ঘর্ষণ ও কম্পনের অভাব।
- জিভের ডগার সঠিক অবস্থান, প্রবল সক্রিয়তা, ভুল শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, গলা ও চোয়ালের মাংসপেশির কাঠিন্য এবং জিভ যদি নরম না হয় অর্থাৎ ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে উচ্চারণ ভুল হয়।

  এখন এই উচ্চারণ ভুল শোধরানোর জন্য আমাদের কিছু অনুশীলন ব্যায়াম আবশ্যক। এবার সেই ব্যায়ামগুলি কি করে করতে হবে তা আলোচনা করা হচ্ছে।

অঙ্গ শিথিলীকরণ (Relaxation)—এটি অনেকটা যোগ ব্যায়ামের শবাসনের মতো। তবে শবাসনের মতো শুধু শুয়ে নয়। দাঁড়িয়েও অথবা বসেও করা যেতে পারে।

প্রথমেই স্থির হয়ে বসতে বা দাঁড়াতে হবে। পায়ের গোড়ালি দুটি রাখতে হবে একের পরে অন্যটি। হাতের অবস্থান হবে বুকের পরে। চোখ বন্ধ। যেন একেবারে ঘুমের মতো। মন হবে যথাসাধ্য চিন্তাশূন্য।

নিম্ন চোয়ালের ব্যায়াম :

ক. শিথিল অবস্থাতে বসে ক্রমশ 'হা' বড় করতে করতে নিচের চোয়ালকে যতদূর পারা যায় প্রসারিত ও সংকুচিত করতে হবে। আস্তে শুরু করে ক্রমে তাড়াতাড়ি করতে হবে। জিভ স্থির রেখে একটানা অ থেকে ঔ পর্যন্ত উচ্চারণের চেষ্টা করলেও নিচের চোয়ালের ব্যায়াম হয়।

খ. চোয়ালকে যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে একবার ডানদিকে ও একবার বাঁদিকে নিয়ে যান। হাতের আঙুলগুলো দিয়ে চোয়ালের কব্জা ও চিবুকের উপরে নরম করে বোলান। এবার একটু তাড়াতাড়ি চোয়ালকে ডানদিক থেকে বাঁদিকে এবং বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিয়ে যান। চোয়ালকে এভাবে নাড়ানোর মধ্যে যেন কোনো শক্ত ভাব না থাকে। সতর্ক থাকতে হবে ঘাড়ে যেন কোনো রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

উত্তেজনা তৈরি না হয়।

গ. চোয়াল ধীরে ধীরে উপরে ও নিচে সহজভাবে ওঠান ও নামান। কিছু পরে ওঠানামার গতি বাড়ান, সমস্ত রকম উত্তেজনা পরিহার করুন।

ঘ. শক্ত আপেল বা পেয়ারার সাহায্যে এই ব্যায়ামটি করা যেতে পারে বা কাল্পনিক বস্তুর সাহায্যেও করা যেতে পারে। এই ব্যায়ামে ঠোঁট দুটো খোলা থাকবে এবং জিভও বেশ জোরেশোরেই নড়াচড়া করবে।

ঙ. শিস্ দেয়াও চোয়ালের ব্যায়াম। বাতাস এসময় স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসে। চোয়াল নরম থাকে। গাল ও নাকের পেশি কাজ করতে থাকে।

চ. চোয়াল নিচের দিকে ঝুলিয়ে, মাথাকে আস্তে আস্তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ও ডানদিক থেকে বাঁদিক নিয়ে যান। কিছুক্ষণ এইভাবে করলে চোয়ালের শক্তভাব চলে যাবে। যখন চোয়াল উপরে তুলবেন। খেয়াল রাখতে হবে যেন চোয়ালটি জোরে চেপে বসে না থাকে।

চিত্র ২৭

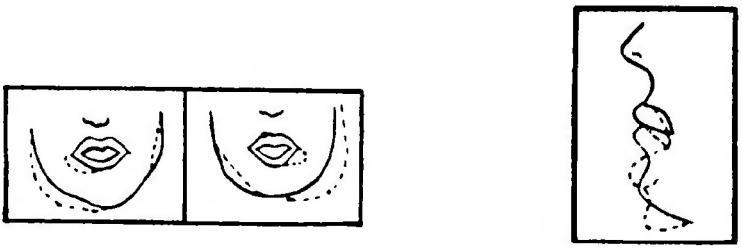

চোয়ালের ব্যায়াম

কোমল তালুর ব্যায়াম—নাক পরিষ্কার করে, নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে আবার নাক দিয়ে তা ছাড়তে হবে। এইভাবে করলেই কোমল তালুর চর্চা চলে। দ্রুত হলন্ত শব্দ বা অনুস্বারান্ত শব্দ উচ্চারণ করলেও কোমল তালু সুসংবদ্ধ হয়। যেমন,

টম্ টম্ টম্ ঠম্ ঠম্ ঠম্

তম্ তম্ তম্ থম্ থম্ থম্

জিহ্বার ব্যায়াম—পরিষ্কার উচ্চারণে জিভ সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে জিভের ডগা যত শক্ত, বলিষ্ঠ বা ধারালো হবে উচ্চারণ তত ভালো হবে। ব্যায়ামের দ্বারা জিভের জড়তা কাটাতে হবে এবং জিভকে নমনীয় করে তুলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. জিভকে মুখের বাইরে এনে টানটান শোয়ানো অবস্থায় রাখুন। এবার জিভের ডগাটিকে উপরের দিকে তুলুন এবং আস্তে আস্তে পিছনের দিকে বাঁকাবার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন জিভটি যেন ভিতরে না চলে যায়। মনে হতে পারে জিভটি বোধহয় বাঁকানো যাবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই দেখবেন খুব সহজেই জিভের ডগা বাঁকাতে পারছেন।

খ. জিভের পুরো অংশ মুখ খুলে বাইরে বের করে এনে শোয়ানো অবস্থায় একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে নিন।

গ. জিভের ডগাটিকে লম্বালম্বি ও কোনাকুনিভাবে পর্যায়ক্রমে উপরের ও নিচের দাঁতে স্পর্শ করান।

ঘ. মুখের ভিতর জিভটিকে যথাসম্ভব উলটিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যান।

ঙ. জিভের নিচের দাঁতের পাটির ওপর দিয়ে ঠোঁটের ভিতর বেশ কয়েকবার জোরে চাপ দিতে থাকুন।

চ. শক্ত তালুর সাথে জিভের ডগা ছোঁয়ান এবং বাঁকিয়ে যতদূর সম্ভব পিছনে নিয়ে যান। কিছু একটা ছুঁড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে জিভের ডগাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিন। ডগাটি যেন শক্ত থাকে। এভাবেই জিভের সাহায্যে কাল্পনিক বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ করা হয়।

ছ. একটা আঙুলকে মুখের কিছুটা সামনে লম্বাভাবে ধরুন। এবার মুখের ভিতর থেকে জিভটিকে শোয়ানো অবস্থায় সেকেন্ডে একবার করে ঠেলে দিয়ে আঙুলের মাথা স্পর্শ করুন। জিভটিকে পেছনের দিকে আনার সময় নিচের দাঁতগুলোর ভিতর দিক যেন স্পর্শ করে। এইভাবে প্রথমে আস্তে এবং পরে গতি বাড়িয়ে চর্চা করুন।

জ. জিভকে মুখের ভিতরে ও বাইরে গোলাকারভাবে প্রথমে ধীর গতিতে ও পরে দ্রুত গতিতে ঘোরান।

ওষ্ঠদ্বয়ের ব্যায়াম—ঠোঁট দুটিকে সহজে নাড়াচাড়া করতে না পারার কারণেই উচ্চারণের ত্রুটি ঘটে। কেননা শুদ্ধভাবে শব্দ উচ্চারণের জন্য জিহ্বার পরই ওষ্ঠের স্থান। ঠোঁটের সঙ্গে গোটা মুখমণ্ডলের কর্মকান্ডই সম্পর্কিত রয়েছে। অনেকে ওপরের ঠোঁট শক্ত রেখে কথা বলতে ভালোবাসেন। ফলে ধ্বনিগুলির উচ্চারণে দন্তবর্ণের প্রভাব পড়ে। ঠোঁটের ব্যবহার না জানার কারণে ওষ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণে গোলমাল দেখা যায়।

ঠোঁটের দুই কোণ চেপে কথা বললে শব্দ কর্কশ ও ক্যানকেনে লাগতে পারে। ঠোঁট অতিরিক্ত ফাঁক করে কথা বললে শব্দ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এসব কারণেই ঠোঁটের ব্যায়াম আবশ্যক।

ক. ঠোঁট দুটি শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। ফাঁক না করে ঠোঁটের দুই প্রান্ত প্রসারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে।

খ. শক্ত করে চেপে ধরা এবং শব্দ করে খুলে দেয়া।

গ. ঠোঁট দুটা শক্ত করে চেপে রেখে ছুঁচলো করে সামনে বাড়িয়ে ধরতে হবে। আবার স্বস্থানে। এটা অনেকটা চুম্বনের মতো।

ঘ. মুখ সামনের দিকে বড় করে খুলতে হবে। এবার হিংস্র মুখভঙ্গি করতে হবে, যাতে ওপরের ঠোঁট পেছন দিকে সংকুচিত হয়ে সামনের দাঁতগুলি বের হয়ে যায়। এর ফলে ঠোঁট দুটি পেছন দিকে টান টান হবে।

ঙ. প্রথমে ঠোঁট দুটি একসঙ্গে লাগিয়ে গোল করে খুলতে হবে। তারপর ঐ গোলাকার খোলা ঠোঁটকে এগিয়ে দিতে হবে। পরে আবার টেনে এনে গোলাকার ঠোঁটকে মিলিয়ে দিতে হবে।

চ. ঠোঁট সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ক্রমে ই থেকে উ এবং উ থেকে ই উচ্চারণ করা এবং আবার এ থেকে ও এবং ও থেকে এ উচ্চারণ করতে হবে।

চিত্র ২৮

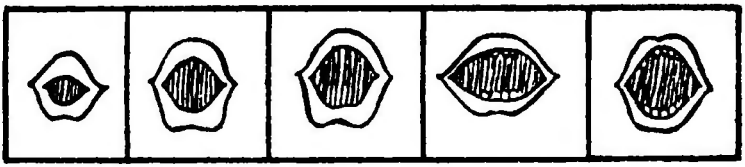

ঠোঁটের ব্যায়াম

জিভের ডগা দিয়ে উচ্চারণ করুন—

লা	লা	লা	লা
লা লা	লা লা	লা লা	লা লা
লা লা লা	লা লা লা	লা লা লা	লা লা লা

এবার জিভকে নিচে ছুঁড়ে দিন এবং উচ্চারণ করুন—

টে টে টে	টে টে টে	টে টে টে	টাহ্
ডি ডি ডি	ডি ডি ডি	ডি ডি ডি	ডাহ্
নি নি নি	নি নি নি	নি নি নি	নাহ্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার জিভের পেছন দিক থেকে বলুন—

কি কি কি	কি কি কি	কি কি কি	কাহ্
গি গি গি	গি গি গি	গি গি গি	গাহ্

এবার ঠোঁট ব্যবহার করে বলুন—

পি পি পি	পি পি পি	পি পি পি	পাহ্
বি বি বি	বি বি বি	বি বি বি	বাহ্
মি মি মি	মি মি মি	মি মি মি	মাহ্

মি মি মি   নি নি নি

চর্চায় জিভ ও ঠোঁট দুটিতে শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। এরা অনুরণনে সাহায্য করে এবং মাত্রা তৈরি করে।

ঠোঁটে ও জিভে উচ্চারণ করুন এবং এর অনুরণন অনুভব করুন।

"Vvvvvvvvvvvvvv" এবং

"Zzzzzzzzzzzz" বলুন। বারবার করুন।

ছ. ঠোঁট দুটো জোড়া করে, দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে জোরে বাতাস বের করে ঠোঁট দুটো দ্রুতগতিতে কাঁপান।

জ. ঠোক দুটির সাহায্যে ঠোঁটের বিভিন্ন রকম আকৃতি তৈরি করুন।

ঝ. ঠোঁটের পাশ দুটো সামনের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করুন যেন মনে হয় ঠোঁট ফোলাচ্ছেন।

ঞ. ঠোঁট দুটো দিয়ে ধীর গতিতে ভোমরার মতো আওয়াজ তোলার চেষ্টা করুন এবং গতি বাড়ান।

জিভের জড়তা মুক্তকরণ : (Tongue Twister) স্বরোৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রগুলির সবসময়ই সচল ও নমনীয় থাকা দরকার। বিশেষ করে ঠোঁট, জিভ, চোয়াল ও কোমল তালুর ব্যায়াম নিয়মিত চালু রাখা দরকার। শব্দের ভুল উচ্চারণের অন্যতম কারণ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের ভুল উচ্চারণ, যুক্তাক্ষর ঠিকমতো উচ্চারণ করতে না পারা এবং বিভিন্ন 'ফলা' বা 'কার' (সাতটি স্বরধ্বনি)-এর সঠিক উচ্চারণ না হওয়া।

এই মুখের জড়তা, জিভের জড়তা মুক্ত করার উপায় হিসেবে নিচে কিছু চর্চা দেয়া গেল। এগুলি পড়তে হবে প্রথমে স্বাভাবিক গতি থেকে দ্রুতগতিতে এবং পরে দ্রুতগতি থেকে স্বাভাবিক গতিতে বারবার বলতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে শব্দ উচ্চারণে অস্পষ্টতা বা জড়িয়ে যাওয়া, এগুলো কেটে গেছে।

১. ক চ ট ত প
খ ছ ঠ থ ফ [প্রথমে পাশাপাশি এবং
গ জ ড দ ব পরে উপর নিচে পড়ুন]
ঘ ঝ ঢ ধ ভ

২. অ আ ই উ এ ও এ্যা
এ্যা ও এ উ ই আ অ

আ→ অ→ ও→ উ→ ই→ এ→ এ্যা
আ→ এ্যা→ এ→ ই→ উ→ ও→ অ→ আ
আ→ এ্যা→ অ→ ও→ এ→ ই→ উ
আ→ অ→ এ্যা→ এ→ ও→ উ→ ই

৩. খ আর ঘ জোর দিয়ে বলুন—
খক্ খক্ খ্যাক্ খ্যাক । ঘট্ ঘট্ ঘ্যান্ ঘ্যান্
খুক্ খুক্ খল্ খল্ । ঘুট্ ঘুট্ ঘ্যাট্ ঘ্যাট্

এবার চ, ছ, জ, ঝ-এর ওপর জোর দিয়ে বলুন—
চিঁ চিঁ ছ্যা ছ্যা । ঝি ঝি ঝাঁ ঝাঁ
গজা গজ্ গজা গজ । খচা খচ্ খচা খচ্
চুক্ চুক্ জ্যাব্ জ্যাব্ । ঝর্ ঝর্ জম্ জম্

এবার ট আর ঠ-এ জোর দিয়ে বলুন
টা টা ঠা ঠা । টি টি ঠি ঠি
টিপি টাপ্ টিপি টাপ্ । ঠিক্ ঠিক্ ঠক্ ঠক
টৌ টে টুক্ টোপ্ । ঠিক্ ঠাস্ ঠস্ ঠস্

ড আর ঢ-এ জোর দিন
ডম্ ডম্ ডিম্ ডিম্ । ঢক্ ঢক্ ঢাম্ ঢাম্
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ । ঢক্ ঢক্ ঢম্ ঢম্

এবার খ আর ধ-এ জোর দিয়ে বলুন
থক্ থক্ থক্ থক । ধুম্ ধুম ধম্ ধম্
থির্ থির্ থর্ থর্ । ধাম্ ধুম্ ধমা ধম্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে স্পষ্ট করে ফ আর ভ বলুন—
ফিক্ ফিক্ ফক্ ফক্ । ভম্ ভম্ ভট্ ভট্
ফুট্ ফাট্ ফিট্ ফাট্ । ভুট্ ভুট্ ভক্ ভক্

এবার ড় উচ্চারণ করুন বেশ জোর দিয়ে—
চড়্ চড়্ কড়্ কড়্ । গড়্ গড় ভড়্ ভড়্
ফড় ফড় মিড়্ মিড়্ । মড় মড় তড় তড়

এবার বেশ জোরে হ বলুন—
হাট্ হাট্ হেট্ হেট্ । হুট্ হুট্ হিট্ হিট্
হুম্ হুম্ হাম্ হাম্ । হুস্ হাস্ হাস ফাস্

৪. পাখী পাকা পেঁপে খায়
৫. কাঁচা গাব পাকা গাব
৬. তক্ তক্, থক্ থক্, তাল পাতা চক্ চক্
৭. তৈতৈ থৈথৈ, থালা ভরা আছে কৈ
৮. তালতলার তাপস বাবু থৈথৈ তালে তালগাছের তলায়
তাতাথৈ নাচিতে লাগিল।
৯. তমাল তলে তাহার হাতে থোকা থোকা তেঁতুল তুলিয়া দিলাম।
১০. তবলার তালে তনু তাতা থৈথৈ তালে থামিয়া থামিয়া তাল তুলিতেছে।
১১. জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা।
১২. চাচা চাঁছা চটা চাঁছে না আচাঁছা চটা চাঁছে।
১৩. গড়ের মাঠে গরুর গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়।
১৪. হকারেরা বাড়ি ফেরে দুপুরের গাড়ি ধরে
সরকারি পুলিশেরা নেড়ে দেয় দাড়ি ধরে।
হকারেরা রাতারাতি দেখে খুব আঁড়ি ধরে
পুলিশেরা বড় বলে মুখ থাকে হাঁড়ি করে।
তার পরে কাড়াকাড়ি, বাবু ছোটে পড়িমরি
সরি পড়ে তড়িঘড়ি, নিজেদের নাড়ি ধরি।
১৫. এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তাঁর দাঁড়ে তার ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাক বলে রেগে মেগে, "বাড়াবাড়ি ওই ত!
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড় কাক হই ত'?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস কবে রে?...

(দাঁড়ের কবিতা-সুকুমার রায়)

১৬. 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম, শুনে লাগে খট্‌কা
ফুল ফোটে ? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌পন্ ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপধাপ—ওকি শুনি ভাই রে !
দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপ্‌ঝাপ্ ঝ-পাস্!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেলো ?—গব্‌গব্ গবা-স্ !
খ্যাশ্ খ্যাশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ঐ রে!
দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙ্গে কই রে!
ঘর্ ঘর্ ভন্‌ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিনতা ?
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজেরে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চীৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার।'

(শব্দকল্পদ্রুম-সুকুমার রায়)

১৭. কমলাকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা কামিনী কলেজের করিডোরে কাঁদিতে কাঁদিতে কপাল কুঞ্চিত করিয়া কাকাকে কহিল, 'কাকা, কাক কা-কা করে কেন' ? কাকা কহিলেন, 'কন্যা, কপাল কুঞ্চিত করিও না। কা-কা করাই কাকের কাজ'।

১৮. খাদিমপুরের খয়রাত খাঁ খয়েরি খাদি পরে খালিশপুরে খইমুদ্দিনের খোঁয়াড়ে খাসি লইতে আসিলেন।

১৯. ঘোষাল পাড়ার গয়াল ঘোষাল গোরান গিয়ে গাঁজা খেয়ে গাঁজার ঘোরে গেঁদুর গায়ে লাগালেন ঘোর ঘুসি।

২০. চাচা ছলিমুদ্দিন চাচির ছাতা ভাঙিয়া চাবুক লইয়া ছুটিয়া চলিল। চাচি ছল্‌ছল্ নয়নে চাচার ছাগলের দিকে চাহিয়া ছানাবড়া চোখে বুক চাপড়াইতে লাগিল।

২১. ছবিরুদ্দিনের ছাগল ছানা ছোলা খাইতে গিয়া ছবিরুদ্দিনের ছাতা ভাঙিয়া ছয়লাব করিয়া ছলছল নয়নে চাহিয়া রহিল।

২২. চকবাজারের চানু চাকলাদার চিড়া চিবাইতে চিবাইতে চানখারপুল পার হইয়া চাঁদপুরের লঞ্চে চড়িল।

২৩. ধানসিঁড়ির দিনেশ ধুনিয়ার দীপ্তিকে ধর্মশালায় ধর্ম মতে দিল দিয়ে দিল।

২৪. পাপ্পু পাতালপুরের গল্প পড়তে পড়তে এপার থেকে ওপার যেতে পা পিছলে পাড় থেকে পানিতে পড়ে গেল।

২৫. ফেলু মিয়া ফাঁপা ফাটা বাঁশ দিয়া ফুলের ফ্ল্যাগ উড়াইয়া ফটো তুলিল।

২৬. ষাঁড়ের গোবরে সার হয় না
কিন্তু বাঁশ দিয়ে বাসা তৈরি হয়।

২৭. শ্যামবাজারের অসুস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশ্ সত্য শর্মা বৃষ্টির মধ্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে খুব কষ্ট করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে শহীদ মিনারের পাদদেশে সিপিএম-এর বিশাল সমাবেশে সশরীরে উপস্থিত হলেন।

২৮. সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল সৈন্যসহ সেনাপতি সেলুকস্ বিশৃঙ্খল শত্রুসৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'রে সসম্মানে স্বসাম্রাজ্যে সশরীরে ফিরে এলেন।

২৯. Plain bun, Plum bun, bun without Plum

৩০. A wicked cricket critic creaked his neck at a critical cricket match

৩১. Peter piper picked a pack of pickle pepper.

৩২. A tidy tiger tied a tie tighter to tidy her tiny tail.

৩৩. On the way I saw six small sick seals.

৩৪. She is seeing ships sitting on the sea-shore.

৩৫. She sells, sea-shells, near the sea-shore.

৩৬. The perfectly purpled bird unfurled its curled wings and whirled over the world.

৩৭. Amidst the mists and coldest frosts
with stoutest wrists and sternest boasts,
He thrusts his feasts against the posts
and still insists he sees the ghosts.

৩৮. The weary wanderer wondered wistfully whether winsome winifred would weep.

৩৯. When and where will you go and why?

৪০. To sit in solemn silence in a dull, dark dock
In a pestilential prison with a life-long lock,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Awaiting the sensation of a short, sharp shock
From a cheap and chippy chopper on a big black block!

৪১. The clumsy kitchen clock click-clacked.

৪২. Didn't you enjoy the rich shrimp salad?

৪৩. The very merry marry crossed the ferry in a furry coat.

এখন যেসব শব্দের সাধারণত ভুল উচ্চারণ হয়ে থাকে, সেই সব শব্দের বানান এবং ভুল উচ্চারণ করার বানানটা পাশাপাশি দেখানোর চেষ্টা করবো, এতে যে ভুলটা আমরা করে থাকি সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে।

শব্দের বানান	ভুল উচ্চারণের বানান	মাড়ি	মারি
শব্দের বানান	ভুল উচ্চারণের বানান	চুড়ি	চুরি
কখন	ককন	হাড়	হার
ঝঞ্ঝা	ঝঞ্জা	ঘোড়া	ঘোরা
ঘণ্টা	গন্টা	সাড়া	সারা
হঠাৎ	হটাত	আমড়া	আমরা
যাচ্ছি	যাচ্চি	ঝড়	ঝর
বাঘ	বাগ	জোড়	জোর
মুখ	মুক	পড়া	পরা
আঘাত	আগাত	তাড়া	তারা
কাঁদা	কাদা	ছাড়	ছার
বাস	বাঁশ	প্রণতি	পোনতি
কুঁড়ি	কুড়ি	শ্রমিক	শোমিক
বাধা	বাঁধা	কৃষক	কিষক
গোঁড়া	গোড়া	করতে	কত্তে
চাঁদ	চাদ	গড়তে	গত্তে
ছাঁদ	ছাদ	মৃত্যু	মিত্যু
শাঁখা	শাখা	প্রোতিবাদ	পোতিবাদ
তাঁহারা	তাঁহাঁরা	আবৃত্তি	আবিত্তি
বড়	বর	সম্মান	সন্মান
ধড়	ধর	অমিত্রাক্ষর	অমৃতাক্ষর
চড়	চর	বঙ্গোপসাগর	বঙ্গোপ্সাগর
মড়া	মরা	পিশাচ	পিচাশ
বাড়ি	বারি	ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের বানান	ভুল উচ্চারণের বানান
মেঘনাদ	মেগনাদ
স্বাস্থ্য	স্বাস্ত্য
দ্যাখা	দ্যাকা
সম্মেলন	সন্মেলন
হাসি	হাঁসি
চিকিৎসা	চিকিস্‌সা
নামুন	নাবুন

এবার কিছু ব্যতিক্রমী শব্দের সঠিক উচ্চারণ দেখানো হচ্ছে।

শব্দের বানান	শুদ্ধ উচ্চারণের বানান
এমন	এ্যামোন
কেমন	ক্যামোন
যেমন	য্যামোন

শব্দের বানান	শুদ্ধ উচ্চারণের বানান
জিহ্বা	জিউভা
আহ্বান	আওভান
বিহ্বল	বিউভল
দ্বিত্ব	দিত্‌তো
স্বত্ব	সত্‌তো
মহাত্মা	মহাত্তাঁ
বাহ্য	বাজ্‌ঝো
সহ্য	সোজ্‌ঝো
চিহ্ন	চিন্‌নোহ্‌
অপরাহ্ণ	অপোরান্‌নোহ্‌
ব্যবস্থা	ব্যবোস্থা
লক্ষ	লোক্‌খো
বজ্র	বজ্‌জ্রো
ব্যতীত	বেতিতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচনের উপাদান ও বলার প্রক্রিয়া

শব্দ উচ্চারণ ভঙ্গি (Diction)

শব্দ উচ্চারণের প্রাথমিক শর্তই হ'লো স্বরধ্বনিগুলিকে ঠিকমতো নিশ্বাসের সাথে বের করা এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে ভালো করে চিবিয়ে বলা।

অক্ষরগুলিকে অতিরিক্ত বেশি পরিষ্কার করে বলবেন না। প্রায়শ দেখা যায়, একজন অভিনেতা একটি শব্দকে আলাদা একক হিসেবে উচ্চারণ করার পরিবর্তে অক্ষরগুলিকে আলাদা করে উচ্চারণ করে থাকেন। অর্থাৎ বেশি পরিষ্কার করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এতে শব্দের আসল প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। লিখিত শব্দ এবং বলবার শব্দের মধ্যে শুরুতেই পার্থক্য রয়ে গেছে। লিখিত শব্দ যদিও বলবার শব্দের মতন প্রায় একইরকম। বলবার শব্দ উচ্চারণ (Diction) হলো এক ধরনের প্রকাশভঙ্গি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যত ধরনের কথা বলবার প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়, সেটা মঞ্চেও দেখা যায়। শব্দ নিয়ে খেলা, ভিতরের অর্থ বের করা এবং সেই সাথে চরিত্রের মানসিক অবস্থাও এই শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

শিল্পসম্মতভাবে উচ্চারণ না হলে মঞ্চে কখনও কখনও অভিনেতার শব্দ উচ্চারণ নিষ্প্রাণ, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের শব্দ উচ্চারণের প্রক্রিয়া খুব মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে হয়। অভিনেতাকে কৃত্রিমভাবে শব্দ উচ্চারণ করাও শিখতে হবে। এই অভ্যাস চরিত্রচিত্রণে, হাস্যরস তৈরিতে এবং চরিত্রের মুখোশ খুলতে সাহায্য করে।

অভিনেয় প্রতিটি চরিত্রই ভিন্ন ধরনের উচ্চারণভঙ্গি তৈরি করতে বাধ্য করায়। ঐ একই চরিত্রের কাঠামোর মধ্যে রেখে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চারণভঙ্গি পরবর্তন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এরই আলোকে কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্চার কথা বলছি।

ক. আপনার পরিচিত কোনো উচ্চারণভঙ্গিকে প্যারডি করার মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

খ. উচ্চারণভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণ করুন (যেমন কন্‌জুস্ ব্যক্তির হঠাৎ বড়লোক বা আধুনিক সাজার ইচ্ছা, পেটুক চরিত্র অথবা একজন অতি ধার্মিক লোক ইত্যাদি)।

গ. উচ্চারণভঙ্গির মধ্য দিয়ে কিছু মানসিক বিকারজাত বা শারীরিক কিছু ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্রচিত্রণ করে দেখানো (যেমন, ফোকলা দাঁত, দুর্বল হৃদয়ের ব্যক্তি, স্নায়বিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তি ইত্যাদি)।

যাই হোক, ব্যঞ্জনবর্ণের উপর খুব বেশি চাপ দিয়ে উচ্চারণ করা ঠিক নয়। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি শুধু অল্প চাপ দিয়ে উচ্চারণ করা উচিত, ব্যঞ্জনবর্ণের ওপর বেশি চাপ—কখনও কখনও স্বরযন্ত্র বন্ধ করে দিতে পারে। উচ্চারণভঙ্গি চর্চা করার সময় ব্যঞ্জনবর্ণের ওপর চাপ দেয়া প্রয়োজনীয়। ঠিক আনুপাতিক হারে স্বরবর্ণের ওপরও চাপ দিতে হবে।

প্রত্যেকটা বাক্যই একটা লম্বা শ্বাসের তরঙ্গের মতই উচ্চারিত হওয়া উচিত। এর ফলে স্বরযন্ত্রের পথ বন্ধ হয় না। কেবল যখন ফিস্‌ফিস্ শব্দের ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হবে তখনই চাপ দেয়া উচিত।

মঞ্চে অভিনয়ের সংলাপ নিয়ে উচ্চারণভঙ্গির চর্চা ঠিক নয়। কেননা এতে করে সংলাপের ব্যাখ্যা উল্টেপাল্টে যেতে পারে। সব থেকে ভালো প্রশিক্ষণ হলো নিজের ব্যক্তিজীবন থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে উচ্চারণভঙ্গি চর্চা করা। অভিনেতা সব সময়েই তার অভিনয়ের উচ্চারণের ব্যাপারে মনোযোগী থাকবেন। এমন কি নিজের কাজের পরিবেশেও। উচ্চারণভঙ্গির আরেকটি কার্যকরী চর্চা হলো, একটি বাক্যকে আস্তে বলতে হবে, এটিকে বারবার বলতে হবে আর প্রত্যেকবারই একটু একটু করে গতি বাড়াতে হবে। তবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ যেন ছোট না হয় বা অস্পষ্ট না হয়। এই চর্চার সময় গতি বা ছন্দ নিয়ন্ত্রণ-এর জন্যে 'মেট্রোনাম' বা গানে তাল রাখার যন্ত্র অথবা নিজের মাড়ির সুন্দনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। একই গতি একদম শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখতে হবে। কবিতার লাইনের মধ্যের বিরতির পর অথবা গদ্যের লাইনের শেষে যেন গতি বেড়ে না যায়।

যদি প্রয়োজনে চিৎকার বা উঁচু স্বরে সংলাপ বলা লাগে, তাহলে অভিনেতা তার শ্বাস জমা রাখবেন এবং প্রয়োজনে আওয়াজ বাড়িয়ে দেবেন। তা না হলে গলায় জোরে চাপ দিলে সেটা ধরা পড়বে। কেননা সেটা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না।

একজন অভিনেতা কখনও চিৎকার করে তার পার্ট শিখবেন না। তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাআপনিই সে এক অনড় ব্যাখ্যা তৈরি করবে। একইভাবে একজন অভিনেতা আরেকজন অভিনেতার পার্ট ব্যক্তিগত জীবনে কখনও মজা করে হলেও বলবেন না বা অভিনয়ের জিনিস নিয়ে মজা করবেন না। এতে আরেকজনের কাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় এবং ঐ অভিনেতা নিজেও বুঝতে পারেন না যে তিনি কত তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন। মহড়া চলাকালীন অভিনেতাকে মহড়াকক্ষে শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে খেয়াল করতে হবে যে উচ্চারণ শ্রবণযোগ্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে কি না। কণ্ঠের মধ্য দিয়ে শব্দ-আবহ তৈরি করার কৌশল রপ্ত করতে হবে। যেমন প্রতিধ্বনি, চড়া স্বর এবং চাপা স্বর। এই চর্চার মধ্যে দিয়েই সচেতনভাবেই উচ্চারণে এই আবহগুলি তার চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিনেতা ব্যবহার করতে পারবেন। কবিতা আবৃত্তি ও গদ্য পাঠে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দ, ব্যবহৃত শব্দাবলি এবং বিরতি বা শ্বাসাঘাত হলো প্রধান বিচার্য বিষয়।

গদ্যের মাঝে ছন্দকে খুঁজে বের করতে হবে অথবা শুধু তার অর্থ উদ্ধার করতে হবে। গদ্য শুনলে যেন তার বিশেষ ছন্দের ধরনটি খুঁজে পাওয়া যায়। একজন ভালো অভিনেতা টেলিফোন ডাইরেক্টরিও ছন্দোময়ভাবে পড়তে সক্ষম। ছন্দ একেঘেয়ে ও বাধাধরা ছন্দের প্রতিশব্দ নয়। ছন্দ হলো স্পন্দন, বৈচিত্র বা হঠাৎ পরিবর্তন। বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ শ্বাসাঘাত খুঁজে বের করার পর, একজন অভিনেতা এতে ঐ শ্বাসাঘাতজনিত ছন্দ ব্যবহার করতে পারেন।

অভিনয়ে সংলাপের বাক্যগুলিকে আয়ত্তে আনা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বাক্য হলো পুরো অংশ। আবেগময় এবং যুক্তিপূর্ণ। এক নিশ্বাসে ও সুরেলা তরঙ্গে তাকে বলে দেয়া যায়। বাক্যের মধ্যে অযৌক্তিক বিরাম ব্যবহার করবেন না এবং খেয়াল রাখবেন স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনিগুলি যেন অবিকৃত থাকে।

কবিতায়ও বাক্যকে আবেগময় ও যুক্তিপূর্ণ হিসেবে ধরতে হবে এবং এক নিশ্বাসে তাকে বলতে হবে। কয়েক লাইন মিলেই (দেড়, দুই বা আড়াই) কবিতায় বাক্য তৈরি থাকে। এখানে প্রত্যেক লাইনের ছন্দ ঠিক রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই ছন্দ যেন একঘেয়ে না হয়। লাইনের পরিচিত বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখতে হবে। লাইন বলবার জন্য কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন গলার টোনের শ্বাসাঘাত অথবা এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যাওয়ার জন্য বিরতি দেয়া।

প্রত্যেকটা লাইনের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য অনেক রকম পদ্ধতি আছে। লাইনের শেষে কেউ কমা অথবা দাড়ি ব্যবহার করতে পারেন। আরেক লাইনের শেষ শব্দের উপর যুক্তিপূর্ণ শ্বাসাঘাত পড়তে পারে এবং হয়তো তৃতীয় লাইনের শেষে একধরনের বিরতি বা গলার টোনের পরিবর্তন করা হলো। যাতে এই প্রকরণগুলিকে অর্থের দিক থেকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা এবং গদ্যে শ্বাস বিরতিরও প্রয়োজন রয়েছে। এই বিরতিগুলি যেন কাছাকাছি না থাকে। তাহলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হবে। অন্যদিকে এই শ্বাসবিরতি যদি অনেক দূরে দূরে থাকে এবং অভিনেতা যদি তার শেষ শ্বাসটুকুও বের করে দিতে চেষ্টা করেন, তাহলে তার স্বরযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে।

অন্যান্য পরিচিত উপাদানও সংযুক্ত করা যেতে পারে—

ক. বাক্যের গতি নিচে নামিয়ে আনা;

খ. হঠাৎ ছন্দে পরিবর্তন আনা;

গ. অযৌক্তিক শ্বাস : বাক্যের এমন জায়গায় নেয়া হলো, যেখানে সচরাচর নেয়া হয় না;

ঘ. শব্দ বলবার অগে শ্বাস গ্রহণ, যা বাক্যের যুক্তিপূর্ণ শ্বাসাঘাত বহন করে।

বাচিক অভিনয়ে দক্ষ প্রত্যেক অভিনেতারই বেশ কয়েক বছর অভিনয় করার পর এক ধরনের গলার সঙ্কট বা সমস্যা তৈরি হয়। এটা বয়সের কারণে হয়ে থাকে। এসময় শারীরিক কিছু পরিবর্তনও হয়। আর সে কারণেই স্বরচর্চা। স্বর প্রক্ষেপণের পদ্ধতি নতুন করে আয়ত্ত করতে হবে। যে অভিনেতা একই জায়গায় থেমে থাকতে চান না, তাদেরকে আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। শিখতে হবে আবার নতুন করে শ্বাস গ্রহণের প্রক্রিয়া, নতুন রীতিতে উচ্চারণভঙ্গি এবং অনুরণন তৈরির প্রক্রিয়া। তিনি অবশ্যই নতুন করে তার কণ্ঠকে আবিষ্কার করবেন।

শব্দের বিশেষ বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি তৈরির জন্য কিছু কিছু কৌশল বা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এবার সেগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করা হচ্ছে।

চলার গতি (Pace)

পাঠ, আবৃত্তি বা সংলাপ বলার সময়ে ছন্দ, অর্থ, বোধ, ভাব-আবেগ ও বক্তব্যের দিকে সচেতন থেকে গতি ও বিরতি গ্রহণের মাত্রাই হলো চলার গতি। কতটুকু একসাথে বলতে হবে, কোন্ দুটি অংশ একসাথে বলতে হবে অথবা মন্থর গতিতে বা দ্রুত গতিতে বলতে হবে—এসব ঠিক করে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে চলাকে 'চলার গতি' বলা হয়। বাক্যের মধ্যে যদি দু'তিন জায়গায় থামতে হয় তো সেই থামা কেমন হবে, কতটুকু থামতে হবে এসবই চলার গতি। তিনটি প্রাথমিক গতি আছে। যেমন, মন্থর, মধ্য ও দ্রুত।

এবার একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

"কাত্যায়ণ। নাড়ী দেখতে জানো? দেখ ত। আমি। বেঁচে আছি কি না? দেখ ত। এ ইহকাল, না পরকাল? এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয় কল্লোল?"

(চন্দ্রগুপ্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

টেম্পো (Tempo)

বলা কখনও দ্রুত হয়, আবার কখনো মন্থর হয়। নাটক চলাকালীনও এই বাড়বার-কমবার খেলা চলে। এই গতির পরিমাপই হলো টেম্পো। একটি নির্দিষ্ট গতি মেনে চলাই হলো টেম্পোর কাজ। টেম্পো হলো—চলার বাড়বার-কমবার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত গড় গতি। গতি কখনো বাড়বে, আবার কখনো কমবে। কিন্তু মূল গতি যেটা কবি, লেখক, নাট্যকার, নির্দেশকের কাম্য সেটা রক্ষিত হবে।

উচ্চারণে জোর বা ঝোঁক বা চাপ (Emphasis / Stress)

কখনও কোনো শব্দকে তার অর্থের ধরন বুঝে বেশি চাপ দিয়ে বলতে হয়। তাহলে অর্থের গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হয়। কোনো অভিনেতা বা বক্তা তার সংলাপে বা বক্তৃতায় যে যে বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাইছেন, তখনই শব্দ বা শব্দাংশের উচ্চারণের ওপর জোর, ঝোঁক বা চাপ প্রয়োগ করতে হয় স্বাভাবিকের চেয়েও। যেমন একটি বাক্য ধরা যাক। 'তুমি কেন এসেছ'? এখানে 'কেন' শব্দটার উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। আবার এই কেন শব্দটাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েও বলা যায়। 'কেন'তে জোর দেয়াতে বক্তার অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। সংলাপগুলি অধিক অর্থবহ, আবেগময় ও প্রাণবন্ত হয়।

আবার শব্দকে প্রয়োজনে দীর্ঘায়িত করে বা দুলিয়েও চাপ তৈরি করা যায়। যেমন,

ছোট্ট— ছো ওওওও ট্ট
বড়— ব অঅঅঅ ড়
মেয়ে— মে এএএএ য়ে
সব— স অঅঅঅ ব
প্রকাণ্ড— প্রকা আআআ ন্ড
ক্লান্ত— ক্লা আআইআ ন্ত
নন্দিনী— ন ন্দি নী ইইইইইই

নিচের অংশটি বলতে গেলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে—

এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য!

সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য!

(চন্দ্রগুপ্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

আবার খেয়াল রাখা উচিত শব্দে অতিরিক্ত জোর বারবার ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে শ্রুতিকটু ও বিরক্তিকর হতে পারে। ঠিক শব্দ নির্বাচন করতে হবে জোর দেয়ার জন্য, তা না হলে দর্শক-শ্রোতা বিভ্রান্ত হবেন। সংলাপ শব্দের অর্থ বুঝেই তবে জোর বা চাপ ব্যবহার করা উচিত তা না হলে শব্দ উচ্চারণ যান্ত্রিক হতে পারে।

বিরতি (Pause)

বিরতি দেওয়া বা থামতে হয় কেন? সংলাপে বা কথা বলায় যেন বিরতির সার্থক ব্যবহার হয়, অপপ্রয়োগ যেন না হয়। বিরতি হলো এক ধরনের প্রকাশভঙ্গি। এটা অর্জনের জন্য কতগুলি আবশ্যিক শর্ত আছে। যেমন,

ক. বিরতির অর্থপূর্ণ সতর্ক ব্যবহার। শুধু যেখানে অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযাগ আছে সেখানেই ব্যবহার করা।

খ. যে বিরতিতে শৈল্পিক কাজ নেই এবং যেটা চরিত্রের গঠনের ওপর নির্ভর করে না। সেই সব জায়গায় বিরতি ব্যবহার না করা (ব্যক্তিগত মানসিক শ্রান্তি এবং স্বাভাবিক দীর্ঘ ও শব্দবহুল অংশ উচ্চারণের ফলেও এটা হতে পারে)।

গ. শ্বাসবিরতি ছোট ছোট অংশে ব্যবহার করলে তা যেন দ্রুত, অনায়াস ও মসৃণ হয়। শ্বাসবিরতির সাথে ছেদ চিহ্নের বিরতির সাযুজ্য রাখা দরকার।

ঘ. সব থেকে জোর দেয়া উচিত কৃত্রিম বা ভানমূলক (artificial or false) বিরতির ওপর। সংলাপের একটা অংশের বিরামের (interval) জন্য অর্থাৎ এক স্বর থেকে অন্য স্বরে ব্যবহারের মাঝখানে বিরতি দেয়া উচিত। একজন অভিনেতার সবসময় ছোট বিরাম নেয়ার চর্চা বেশি করা উচিত। কেননা লম্বা বিরাম গ্রহণ থেকেও পরিমিত ও মাপমতন ছোট বিরতি গ্রহণ বেশি কষ্টকর।

সঠিক বিরতি গ্রহণ সংলাপের শ্রুতিগ্রাহ্যতা ও বোধগম্যতাকে নিশ্চিত করে এবং ভাব-ব্যঞ্জনাকে উদ্দীপিত করে। স্পষ্ট করে ছোট ছোট বিরতি দিয়ে বললে মূল কথাগুলির উৎকর্ষ বাড়ে। অন্যান্য বাক্য থেকে তাদের আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। শব্দহীন দীর্ঘ বিরতি আবার সংলাপকে নতুনভাবে ভাবময় করে তোলে।

এবার বিরতির প্রকারভেদ। এগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

ক. ছেদ চিহ্ন নাট্যকার বা লেখক নিজের ভাবনা অনুযায়ী কিছু দিক-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যেমন, কমা, সেমিকোলন, কোলন-ড্যাস, দাঁড়ি, হাইফেন, ফুটকি অর্থাৎ সংলাপ বলবার সময় কোথায় কম থামতে হবে, কোথায় বেশিক্ষণ বিরতি দিলে ভালো হয়, তার একটি দিক-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাকেই বলে ছেদ চিহ্ন বা যুক্তিসম্মত বিরতি।

আবার যতিও এক প্রকারের বিরতি। যতি (Scan বা Poetic Pause) পদ্য এবং গদ্য দুই জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. ভাবের বিরতি (mood pause)—একটি বড় সংলাপে বা কবিতার এক এক অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হলে, এই ভাবের সার্থক পরিবর্তন আনার জন্য ভাব বিরতি গ্রহণ করা হয়। যেমন, লজ্জা থেকে আশঙ্কা, আশঙ্কা থেকে আনন্দ, আনন্দ থেকে গ্লানি, এইরকম ভাবের পরিবর্তনে ভাববিরতির ব্যবহার।

গ. শব্দের ওপর জোর দেয়ার জন্য বিরতি—যে-কোনো শব্দের উচ্চারণের আগে যদি সচেতন ও সুনিশ্চিতভাব বিরতির ব্যবহার করা যায়, শব্দটি পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়, শব্দের অর্থের গুরুত্বে মাত্রা যোগ হয়, তবে দর্শকদের সেই শব্দের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

ঘ. মনস্তাত্ত্বিক বিরতি (Psychological Pause)— দর্শক শ্রোতার মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার হয় মনস্তাত্ত্বিক বিরতি। এটা একধরনের থেমে থাকা, যা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এই বিরতির সময় মুখের অভিব্যক্তি, চোখের কাজ ও ইঙ্গিতপূর্ণ চলাফেরা বিরতিকে ভরিয়ে তোলে। নাট্যমুহূর্ত তৈরির জন্য এটি যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ ব্যবহার করা যায়। এমন কি একটা পুরো দৃশ্যও মনস্তাত্ত্বিক বিরতি দিয়ে সাজানো যায়।

আবার বেশিক্ষণ মনস্তাত্ত্বিক বিরতি ব্যবহার করলে একঘেয়েমি আসতে পারে। একঘেয়েমি আসার আগেই সংলাপ শুরু করা উচিত। আবার অর্থহীনভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিরতি ব্যবহার করলে দর্শকরা বিরক্ত হবে এবং ভাববে অভিনেতা পার্ট ভুলে গেছে।

ঙ. শ্বাসবিরতি (Breath Pause/Respiratory Pause)—দ্রুত সংলাপ বলার সময় বা গড়গড় করে বলবার সময় শ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে খুব সামান্য বিরতি দিয়ে অর্থাৎ আবার শ্বাস ভরে নিয়ে বলে যাওয়া। এই বিরতিকে শ্বাসবিরতি বলে। অনেকে এটাকে চোরা দমও বলে থাকেন। কেননা এর স্থায়িত্বকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। সংলাপ বলাও পূর্ব গতিতেই চালু অবস্থায় থাকে।

চ. ক্রিয়াজনিত বিরতি (Action Pause)—সংলাপের মধ্যে থেকে কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা যখন চূড়ান্তভাবে শেষ হয়, তখন ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়। আর সে কারণেই সেখানে বিরতি নেয়া প্রয়োজন। আবার কখনো কখনো এই ক্রিয়া বা এ্যাকশনকে সক্রিয় করার জন্যও বিরতি গ্রহণ করা হয়। সংলাপ বলার সময় অতীতের কোনো ঘটনা বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ছবি বা ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে বিরতি গ্রহণ করা হয়, তাকে ক্রিয়াজনিত বিরতি বলে।

ছ. বয়সের কারণে বিরতি—বৃদ্ধ বয়সের চরিত্রের সংলাপ বলার কোনো স্টেশন থাকে না। কেননা তাঁদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা একজন যুবকের কর্মক্ষমতা থেকে অনেক কম। তাই বৃদ্ধ লোকদের বারেবারে শ্বাসগ্রহণ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় এবং বারবার থামতে হয়। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে বৃদ্ধটি বাস করছেন, (চরিত্র অনুযায়ী) সেইভাবে বিরতি গ্রহণ করতে হয়।

জ. হাসির দৃশ্যের অভিনয়ে সংলাপে বিরতি—একটি কমেডি নাটকে কমিক চরিত্রে অভিনয়ের সময় সংলাপ শুনে দর্শকরা করতালিতে এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। তখন ঐ গোলমালের (Noise) মধ্যে সংলাপ বলা উচিত নয়। কেননা হাসির শব্দে ও করতালির শব্দে পরের সংলাপ শোনা যাবে না। তাই যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে এবার শুরু করা যায়—ততক্ষণ শুরু করা উচিত নয়। সংলাপ ঐ হাসির মধ্যে শুরু করলে হারিয়ে যাবে। তখন দর্শকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নাও পেতে পারেন। তবে দর্শকের হাসি কতটুকু থামলে বা কমলে সংলাপ শুরু করা উচিত, সেটা দক্ষ অভিনেতার নিজস্ব ধারণার ওপর নির্ভর করে।

ঝ. ছন্দোময় বিরতি—সংলাপে কথার উত্তরে কথা বলবার সময় অনেক সময় অন্য চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্য চরিত্রটি নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে উত্তর দিলে এই বিরতিতে ছন্দোময় বিরতি বলে।

ঞ. অর্থানুসারী বিরতি—(sense pause) অর্থ যেখানে মোটামুটি শেষ হয়, সেখানে বিরতি গ্রহণ করলে ভালো। অর্থানুসারী বিরতি হলো Logical Pause-এর সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক।

স্বরের ওঠানামা বা স্বরভঙ্গি (Voice Modulation)

কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনার জন্য স্বরকে বিভিন্ন স্তরে ওঠাতে নামাতে হয়। স্বরের একটা স্তর থেকে স্বরের অন্য স্তরে যাওয়া-আসাকেই স্বরভঙ্গি বা স্বরের ওঠানামা বলে। চরিত্রের নানারকম জটিলতা পরিষ্কার করতে কণ্ঠস্বরকে নানান ঢঙে নানানভাবে চলতে হয়। এজন্যে স্বরের আয়তন (Volume), স্বরের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (timbre), স্বরস্তরের বিস্তৃতি এবং স্বরে নানান রঙ লাগানোর এবং ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করত হবে। ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই অভিনেতাকে স্বরভঙ্গি প্রয়োগ করতে হয়।

স্বরের স্বচ্ছতা (Clarity/Articulation)

পরিপূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে এবং নিশ্বাসের সাথে সঠিক স্বরস্থান নির্ধারণ করে বর্ণের উচ্চারণে চমৎকারিত্ব আনা, স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা আনা, চিবিয়ে চিবিয়ে না বলা, সহজ ও অনায়াসভঙ্গিতে বলা এবং শব্দের শেষ অক্ষর যাতে পড়ে না যায় বা অস্বচ্ছ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে উচ্চারণ করলে স্বরের স্বচ্ছতা অর্জন সম্ভব। কম প্রচেষ্টায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার বলতে পারা এবং অর্থকে বোধগম্য করে তুলতে পারাই স্বরের স্বচ্ছতা। স্বরের স্বচ্ছতাকে এক অর্থে articulation-ও বলা হয়। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এবং বোধগম্য হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় articulation। প্রত্যেকটি শব্দ আমরা যখন উচ্চারণ করি তখন পিছনে বাতাসের যোগান থাকে। বাতাসের ধাক্কাতেই শব্দগুলি বিভিন্ন উচ্চারণস্থান ছুঁয়ে পরিষ্কারভাবে শব্দ বা আওয়াজের আকারে ধ্বনিত হয়। প্রত্যেক শব্দের পিছনে বাতাসের যোগান কম হলে উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়। বাতাসের ধাক্কা কম পেলে শব্দের উচ্চারণ বিকৃত, অস্পষ্ট বা অস্বচ্ছ হয়। বাক্যের শেষ শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রায়শই এধরনের ঘটনা ঘটে বা Tail drop হয়। শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ এই কারণে খুবই জরুরি। সেই জন্য Properly articulated voice is always good.

কথা বলার সুর (Intonation)

বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের কারণে ও বিভিন্ন রীতির প্রয়োগে একধরনের সুর পরিলক্ষিত হয়। আবার সুরের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলার সুর গড়ে ওঠে। স্বরভঙ্গিতে সুরের বৈচিত্র্যকেই কথা বলার সুর বলা হয়।

অভিনয়ে সঠিক ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হলে স্বরগ্রামের ওঠানামা ও সুরের এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় যাওয়ার ওপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সুর হলো সংলাপের শ্বাস-স্পন্দন। একজন সঙ্গীতশিল্পীর মতোই অভিনেতাকে স্বর-এর চর্চা করতে হবে। স্বরকে উদারা-মুদারা-তারা'র এই তিন গ্রামেই সহজ ও অনায়াস ভঙ্গিতে খেলাতে পারতে হবে। তাহলেই স্বরের বৈচিত্র্যের কারণে সঠিক ভাবের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুটিত হবে। শ্রোতা যে অভিনেতার সংলাপের অভিব্যক্তির ভালো মন্দ বিচার করেন, তা শুধু সংলাপে সুর প্রয়োগের কারণেই। একজন অভিনেতা এই সুর অর্জন করেন তার চিন্তা-চেতনা-ধারণা এবং মনের আবেগ থেকে।

একজন অভিনেতা বিভিন্ন সুরের সহযোগে স্বর ও সংলাপে ঝংকার তোলেন। এই সুরের ভাষাতেই চরিত্রের শ্রদ্ধা, আনন্দ, গর্ব, কৌতূহল অলসতা, ক্লান্তি, বিষাদ ইত্যাদি নানান অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। মনের মধ্যে যখন কোন ভাব নিয়ে খেলা চলতে থাকে, প্রকাশ করতে গিয়ে তার মধ্যে থেকে একরকম সুরের প্রকাশ ঘটে। এই সুর ব্যঞ্জনাধর্মী।

শ্বাস স্বরতন্ত্রীতে ধাক্কা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পথে নাক, মুখ ও গলবিলে ঝংকার তোলে। আর তাতেই জিভ, নরম তালু, দাঁত, ঠোঁটের বাধার কারণে শব্দের সৌন্দর্য তৈরি হয়, আর সেই সাথে নাক, মুখ, গলবিল সমানভাবে ঝঙ্কার তুলবে তখন সুরের সৌন্দর্য তৈরি হবে। মোটা গলার ব্যবহার একনাগাড়ে হলে একঘেয়েমি জন্মে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব বেশি করে গলবিলকে ব্যবহার করলেই এই ভারি, মোটা, নিস্তেজ স্বরের জন্ম হয়। নাকের অল্প ব্যবহার ভালো। কিন্তু বেশি হলে নাকি-নাকি সুরের জন্ম দেয়।

নাক, মুখ, গলবিলের ঝংকার সৃষ্টির জন্য একটা চর্চা প্রয়োজন। তাহলে গলায় অনুরণন ও সেই সাথে সুর তৈরি হবে। মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে 'হুম' এই শব্দে হামিং ধ্বনি তুলুন। অথবা মুখ খুলে 'আ' ধ্বনি উচ্চারণ করুন প্রক্ষেপণের ভঙ্গিতে।

এছাড়া হারমোনিয়ামের সাহায্যেও গলার সুর তৈরির ব্যায়াম করা যায়। যে পর্যন্ত খাদে গলা অনায়াসে যায় এবং শোনা যায়, স্বর পরিষ্কারভাবে সে পর্যন্ত নেবার চেষ্টা করতে হবে। আবার সেখান থেকে উঠতে উঠতে গলা যতখানি উঁচুতে যেতে পারে অনায়াসে, সেই পর্যন্ত অর্থাৎ খাদের শেষ স্বর থেকে চড়ার শেষ স্বরটি পর্যন্ত অনায়াস গমনাগমন নিশ্চিত করতে পারলে সুরের খেলা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে। অভিনেতা যেহেতু কোনো নোটেশন বা স্বরলিপি নিয়ে কাজ করেন না। সেইজন্য তিনি স্বাধীনভাবে, কোনো বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে না গিয়ে স্বর নিয়ে নানান মেজাজের খেলা করতে পারেন।

সুরের নানান রকম চলার গতি। কখনও সোজাভাবে, কখনও বেঁকে, কখনও উপরে উঠে, কখনও নিচে নেমে, কম-বেশি অনুপাতে বিভিন্ন রকমের ভাবব্যঞ্জনা তৈরি হচ্ছে সুরের মধ্য দিয়ে। ঈপ্সিত বা কাম্য ব্যঞ্জনা কোন্‌টি হবে তার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। শুধু নিজের সচেতন মনের বিক্ষেপে নিয়মিত অভ্যাস ও চর্চার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে।

ভালো সুরের খেলা খেলতে গেলে স্বরকে নমনীয় রাখতে হবে, চোয়াল ও ঘাড়ের এবং সমস্ত শরীরের সন্ধিগুলোর শিথিলীকরণ ব্যায়াম করা উচিত। সেই সাথে স্বরকে বিভিন্ন পর্দায় ওঠানামার চর্চা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্যে প্রথমে একটি শব্দকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে। সুরে প্রকাশভঙ্গি সঠিক হচ্ছে কি না খেয়াল করতে হবে। আয়নার সামনে বসে করলে প্রকাশভঙ্গি দেখা যাবে এবং বোঝাও যাবে ঠিক হচ্ছে কি না। শব্দগুলি এমন হতে পারে। যেমন, আমি, তুমি, হ্যা, না, ওঃ, কি, কে, ইত্যাদি। একইভাবে একটি বাক্য ঠিক করে তাকে বিভিন্ন রকম অর্থে বলার অনুশীলন করুন।

স্বরের বৈচিত্র্য ও কণ্ঠে সুর আনবার জন্য আরো কতগুলি অনুশীলন করা যেতে পারে। যেমন, পরিচিত মানুষদের কণ্ঠস্বর নকল করা, ঝড়ের শব্দ, সমুদ্রের ঢেউ, মোটর গাড়ি বা স্কুটার স্টার্ট করা, এরোপ্লেনের আওয়াজ, রেলগাড়ির আওয়াজ, পশুপাখির আওয়াজ, বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বর, বিদেশী ভাষার মতো ভঙ্গি করে বলা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বর নকল করে বলার চেষ্টা করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর প্রক্ষেপন (Voice Projection)

শরীর এবং মনের সংযোগে স্বরকে দূরে ছুঁড়ে দেয়া যায়। অভিনয়ে স্বর প্রক্ষেপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অভিনয়ে স্বরকে প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারির আসনে বসে থাকা দর্শকরাও যাতে শুনতে পায়, সেইভাবে স্বরের স্তরকে তৈরি করে স্বর প্রক্ষেপণ করতে হয়। স্বরের স্তরকে স্বাভাবিকের থেকে একটু উঠিয়ে নিয়ে এবং সেই স্বরকে স্বাভাবিকের মতো করে প্রক্ষেপণ করাই হলো মঞ্চে সঠিক স্বর প্রক্ষেপ।

দেখা যায় অনেক অভিনেতার কণ্ঠ অত্যন্ত ভালো, এবং কণ্ঠে মাধুর্যও আছে। কিন্তু তার গলার আওয়াজ শেষ সারি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো মতে পৌঁছচ্ছে। তখন নির্দেশক তাকে বললেন স্বর প্রক্ষেপণের মাত্রা আরো বাড়াতে। কিন্তু দেখা গেল সেই অভিনেতা অযথা চিৎকার করে গলা নষ্ট করছেন এবং তার গলার সকল মাধুর্য নষ্ট হচ্ছে। তাহলে কেন এরকম হচ্ছে? সঠিক প্রক্ষেপণ হচ্ছে না ?

প্রচুর পরিমাণে পেট ভরে বুক ভরে শ্বাস নিতে হবে। ডায়াফ্রাম-এ চাপ দিয়ে নিশ্বাসের সাথে শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলিকে ঠিক মতো ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। অনুশীলনে অল্প শ্বাস নিয়ে কথা বললে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

স্বরে শ্বাস জড়িয়ে গেলেও শ্বাসের অপচয় হবে। দুর্বল স্বর সৃষ্টি হবে। প্রক্ষেপণ হবে না। শ্বাস জড়ানো স্বর হলো সেগুলি, স্বর সৃষ্টি হওয়ার আগেই যা বেরিয়ে আসে। ফলে শ্বাসের স্বল্পতার কারণে অব্যবহৃত নিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে স্বরবিকৃতি ঘটে এবং টেল ড্রপ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন স্বরের পরিচ্ছন্নতা এবং দৃঢ় ভিত্তি। এগুলিই স্বর প্রক্ষেপণের আবশ্যিক শর্ত।

শ্বাসজড়ানো স্বর এবং পরিষ্কার স্বরের পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে। তারপর স্বচ্ছ স্বর সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যতক্ষণ না সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বচ্ছ স্বর যেহেতু উঁচু আওয়াজের, তাই তাকে শ্বাসজড়ানো স্বরের চেয়ে সহজে প্রক্ষেপ করা যায়।

ছন্দ-স্পন্দন (Rhythm)

কথায় বা সংলাপে আবেগ সঞ্চারিত হলে ছন্দ-স্পন্দন প্রকাশ পায়। যেখানেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যেখানেই জীবন এবং গতি সেখানেই ছন্দ লুকিয়ে আছে। অর্থগতভাবে সময় ও পর্যায়ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট ধরনের ধ্বনি পরম্পরার পুনরাবৃত্তিকেই ছন্দ বলা হয়। একঘেয়ে ও একটানা ধ্বনির বদলে বৈচিত্রপূর্ণ ও মাত্রার দ্বারা নিয়মাবদ্ধ শব্দের গতিকেও ছন্দ বলা হয়। সংলাপ বলবার সময় আমরা কখনো মন্থর গতি, কখনো মধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা দ্রুতগতিতে বলি। কিন্তু প্রত্যেকটা গতিই একধরনের ছন্দ মেনে চলে অলক্ষ্যে। না মেনে চললেই ঘটে তখন ছন্দপতন। সেইজন্য বাচিক অভিনয়েও আমরা বলতে পারি সুরের সঙ্গে যেন স্বর তালে তালে নেচে চলেছে। নিয়মিতভাবে কণ্ঠকে কমিয়ে বাড়িয়েও ছন্দ-স্পন্দন অনুভূত হয়। অভিনয়ের চরিত্রে, ছন্দ-স্পন্দন থাকে। একটা চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশ, কথাবার্তা একটা বিশেষ রীতিতে প্রকাশ পায়। এক একজনের এক এক ধরন। তাই এক একজনের চরিত্রে ছন্দ-স্পন্দন এক এক রকমের। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা চরিত্রগত ছন্দ-স্পন্দন থাকে। চরিত্রের যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে নিয়মিত প্রকাশ পায় সেটিই ঐ চরিত্রের রূপ বা ছন্দ স্পন্দন।

তেমনি কণ্ঠস্বরের অনুভবযোগ্য নিয়মিত পরিবর্তন, বাচন-রীতি, চিন্তাধারা, অভিব্যক্তি, গতিভঙ্গির মধ্য দিয়েও চরিত্রের ছন্দ-স্পন্দন প্রকাশিত হয়। নাটকে চরিত্রের জীবনীশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশের জন্য যে প্রবাহ ও গতির দরকার হয় তাই ছন্দ।

আকর্ষণীয় ও দারুণ সুন্দর ও চমৎকার সংলাপ বলতে গেলেও ছন্দ-স্পন্দন অনুভূত হয়। গতি, ঝোঁক, বিরতি ও সুর এগুলির সমন্বয়েই চমৎকার সংলাপের উচ্চারণে মাধ্যমে তৈরি হবে ছন্দ। ছন্দ ছাড়া কোনো কিছুই যেন সম্ভব নয়।

স্বরের গুণগত মান নির্ধারণের উপাদান ও ব্যায়াম এই পর্যায়ে উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে বাচনে প্রয়োগ করতে পারলে বাচনের নান্দনিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। এখন অনুশীলন বা চর্চার জন্য কিছু নির্বাচিত কবিতা ও গদ্যাংশ তুলে দেয়া হলো। এগুলি চর্চা করলে ফলদায়ক হবে। তবে প্রত্যেকটি অংশ কিভাবে পড়তে হবে এবং কোন্ কোন্ উপাদান কোথায় কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে হয়। চর্চা করলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে বলে বিশ্বাস।

অনুশীলনী

১. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

[বনলতা সেন—জীবনানন্দ দাশ]

২. বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে ?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা ?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানি নি।
তোমার দেশ ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য ?
পারতাম বটে তাকে ভালবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন ?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কি ভালোবাসো তুমি ?
আমি ভালোবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে...
আমি ভালবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

['অচেনা মানুষ'-শার্ল বোদলেয়র—অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু]

৩. বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংশ দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
লাঙ্গল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই

হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।
কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
কোনদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।
রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী প্যাখির ছতরে,
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙ্গে ছল ছল
আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল,
এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।

[(১৪) সোনালি কাবিন—আল মাহমুদ]

৪. ভাবছি ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এত কালো মেখেছি দুহাতে
এতো কাল ধরে!
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে।

[যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো—শক্তি চট্টোপাধ্যায়]

৫. যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে 'মা', 'বাবা', 'দু', 'দে' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়।...

রিপোর্ট কমিশ্যনরিতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেন্টে গেল। গবর্ণমেন্টের এই বিবেচনা— যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই 'দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের' উত্তর মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইন্ডিয়ান গবর্ণমেন্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর, তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

('মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৬. আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখমণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীতকালের রাত্রে হি হি করিয়া লেপ মুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্ষারাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহলে মুহুর্মুহু জাগিয়ে উঠিতেছে, তখন ঘরের এক নিভৃত কোণে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুরফুরে সন্ধ্যাসমীরণের সহিত ফিনফিনে উড়ানীর সখ্য-বেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক ছাতে মাদুরের উপর অর্দ্ধ-উপবিষ্ট ও অর্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা খুড়িমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষকারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা-দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া সোনার কাটি রূপার কাটি গল্পের মাঝে মাঝে হুঁ না দিয়াছেন, কিম্বা সেই উপন্যাস পৃষ্ঠে 'তা'র পর তা'র পর' শব্দের চাবুক কখনো মৃদুভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন।

(সোনার কাটি রূপার কাটি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. কোন এক নগরে এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ একশত টাকার এক তোড়া বস্ত্রে বান্ধিয়া স্নান করিতে জলে নামিলে পর ডুব দিয়া উঠিয়া দেখে আপন বস্ত্রে তঙ্কার তোড়া নাই। ইহাতে বড় দুঃখী হইয়া ঐ স্থানের বিচারকর্তার স্থানে নিবেদন করিলে তিনি আপন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন এবং পাঁচজন পেয়াদা ও দুইজন কোড়া বরদার তাহার সাথে দিয়া আজ্ঞা করিয়া দিলেন—'যে স্থানে ব্রাহ্মণ তঙ্কার তোড়া রাখিয়াছিলেন সে স্থানে পেয়াদারা ঘিরিয়া থাকহ এবং তথা কোড়া ক্ষেপণ করহ।' তারপরে তাহারা সেইমত করিলে যে সে টাকা লাইয়াছে সে একজন ভারি জলবহা গোয়ালা সেই স্থানে আসিয়া বলিল যে তোমরা এই স্থানে কোড়া মারিলে কি তোমাদের টাকা পাইবা? তখন পেয়াদারা বলিল, "আমরা টাকা পাইবার ফিকির করিতেছি তুই কিমতে জ্ঞাত হইলি।' এই কহিয়া তাহাকে কর্তার সাক্ষাৎ লইয়া প্রহার করিলে গোপ সে টাকা ফিরিয়া দিল।

এই কৌশলে তথাকার বিচারকর্তা কাঙ্গালি ব্রাহ্মণের হারানিয়া মুদ্রা দেওয়াইলে ব্রাহ্মণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(ইতিহাসমালা—উইলিয়ম কেরি)

৮. আমার এই খোলা জানলার মধ্য দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে—কিন্তু এক একটা দেখে ভারি মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন গরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোট উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে—আজ ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণস্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশীতে তার গলা খন-খন করচে—মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম। ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল—কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল। ছেলেটা নিতান্ত ছোট—আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যে একটা ideal-এর উপর আঘাত লাগে—বিশ্বস্তচিত্তে চল্‌তে চল্‌তে খুব একটা হুচট্ লাগার মত। ছোট ছেলেরা কি ভয়ানক অসহায়—তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিদারুণ কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরো বিরক্ত করে তোলে, ভাল করে আপনার নালিশ জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই—তার উপরে কাশি—তার উপরে এই ডাকিনীর হাতে মার।

(একটি চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯. কর্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন, এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল, 'এক সাহেবলোগ্‌কা মেম আয়া।'

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। এমন সময় বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা আরক্তকপোলা আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা দুগ্ধফেন শুভ্রা হরিণ লঘুগামিনী ইংরেজ মহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না।...

এমন সময় ভুমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলনচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

(প্রায়শ্চিত্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০. পাঠক মহাশয়, 'রূপের আলো' কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে 'দশদিক্ আলো' করে। বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু মিটমিটে, তেল চাই নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য চলে, নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড় সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু জ্যোতির ন্যায়, সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য হয় না; তত প্রখর নয় এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাবময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

(দুর্গেশনন্দিনী — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

রস–ভাব–আবেগ

সাধারণ অর্থে রস শব্দে স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে রস শব্দে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বোঝায়। রস থাকলেই কাব্যকে জীবিত বলা যায়। সেজন্য রসকে কাব্যের আত্মা বলা যেতে পারে। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত আবেগ বা ভাবকেই রস বলে। অভিনয় দ্বারা অন্তর্হৃদয়গত রসকে যা প্রকাশ করে তাকে ভাব বলে। রস উৎপন্ন না হলে ভাবের কোন পৃথক সত্তা নেই। ভাবের দ্বারা যেমন রস প্রকাশিত হয়, রসের দ্বারাও তেমনিভাবে ভাব প্রকাশিত হয়। মঞ্চে অভিনয় ভাল হলে দর্শকদের মধ্যে একধরণের পরিতৃপ্তি বা আনন্দের অনুভব সঞ্চারিত হয়। এই গভীর অনুভূতিরই অন্য নাম 'রস'। রস কথাটির অর্থ আনন্দ আস্বাদন। সবরকম ভাবেরই পরিণাম রসানুভব। রস ছাড়া কোন বিষয়ের অবতারণাই সম্ভব নয়। যেখানে হস্ত সেখানেই নয়ন, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মন, যেখানে মন সেখানেই ভাব, আর যেখানে ভাব সেখানেই রস। মানুষের মনের ভিতরে অজস্র ভাব কিলবিল করে। ভাব হচ্ছে রসের মৌলিক উপাদান। ভাব লৌকিক কিন্তু রস অলৌকিক।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি 'রসশাস্ত্র' সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষের মনের গভীরে কোন ঘটনায় বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নানান মনের ভাব তৈরি হয়। সংস্কৃত নাট্যবেত্তারা মনের এই সব নানান অনুভূতি বা রঙ বা ভাব ঊনপঞ্চাশ ভাগে ভাগ করেছেন। এই ঊনপঞ্চাশ ভাবের মধ্যে নয়টি হলো স্থায়ী ভাব, যা রস নামেই পরিচিত। অপ্রধান যা থাকে তাকে বলা হয়েছে সঞ্চারী ভাব। তা হলো মোট ৩৩টি। এই রস নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে,

'ভাব বিভাবানুভাব ব্যভিচারী সংযোগৎ রসনিষ্পত্তি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব মিলে রসকে পরিণত ও আবেদনগ্রাহ্য করে তোলে।

মোট ভাবের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ–শ্রেণীগত বিভাগ তিনটি।

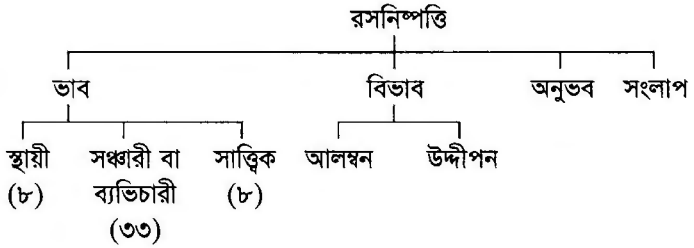

ভাবগত অভিব্যক্তিতে বিভাব ও অনুভাব স্বধর্মী সহায়ক আর সংলাপ অন্যধর্মী বিশেষ সহগামী–ব্যাপকতর অর্থে অন্যতম ভাববিশেষ। নাট্যশাস্ত্রে এই স্থায়ীভাবের অভিনয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোন একটি স্থায়ীভাবকে কেন্দ্র করে এই ভাবগুলো আবর্তিত ও পরিণত হয়ে স্থায়ীভাবের রসকে অভিব্যক্ত হতে সাহায্য করে। আটটি স্থায়ীভাবের কথা নাট্যশাস্ত্রে বলা হলেও 'সাহিত্যদর্পণ' কার বিশ্বনাথ দশটি স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন। একটি শমভাব, যার রস শান্তরস। অন্যটি স্নেহভাব-রস বাৎসল্যরস।

ভাব	রস	বর্ণ	দেবতা
রতি	শৃঙ্গার	শ্যাম (Light Green)	বিষ্ণু
হাস	হাস্য	শ্বেত (White)	প্রমথ
শোক	করুণ	কপোত (Ash)	যম
ক্রোধ	রৌদ্র	রক্ত (Red)	রুদ্র
উৎসাহ	বীর	গৌর (Light Orange)	ইন্দ্র
ভয়	ভয়ানক	কৃষ্ণ (Black)	কাল
জুগুপ্সা	বীভৎস	নীল (Blue)	মহাকাল
বিস্ময়	অদ্ভুত	পীত (Yellow)	গন্ধর্ব
শম	শান্ত	কুন্দেন্দু (Extreme White)	নারায়ণ
স্নেহ	বাৎসল্য	পদ্মগর্ভ (Light Yellowish)	লোকমাতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতিভাব– রতিভাবজনিত রস হচ্ছে শৃঙ্গার। প্রেমগত এই ভাবের ভিত্তিস্বরূপ কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাসভাব– অসঙ্গতিতে হাসভাবের প্রতিষ্ঠা। হাসভাবের পেছনে সক্রিয় থাকে জীবনগত অসঙ্গতির অনুকরণ। অনুকরণের এই কৃত্রিমতা ও সাফল্যই হাসির জন্ম দেয়।

শোকভাব– শোকভাব মূলতঃ অপ্রাপ্তি ও বিচ্ছেদজনিত। প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পদহানি, হত্যা, বন্দীত্ব প্রভৃতি শোকের কারণ।

ক্রোধভাব– ক্রোধভাব মনের ভাবগত কাঠিন্য, রুক্ষতা ও প্রচণ্ডতার প্রকাশ বিশেষ। যে কয়টি ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে তা' হলো তিরস্কার, কলহ, গালিগালাজ, বিতণ্ডা আর বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধাচরণে।

উৎসাহভাব– উৎসাহভাবের পেছনে আছে বিষাদহীনতা, ক্ষমতা, ধৈর্য, বীরত্ব।

ভয়ভাব– এই ভাবটি কোন একজনের শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুণ্নকারী কার্যধারা, নির্বাসিত মানুষের বনবাস, হাতী অথবা সাপ দেখা, জনহীন গৃহে অবস্থান, বর্ষার নিবিড় রাত, পেঁচার কর্কশ চিৎকার, নিশাচর পশুদের হুঙ্কার ইত্যাদি কারণে জাগ্রত হয়ে থাকে।

জুগুপ্সাভাব– অসুন্দর কিছু দেখা ও অভিজ্ঞতা থেকে এই ভাব জন্ম নেয়।

বিস্ময়ভাব– সাধারণত মায়া, বিভ্রম, ইন্দ্রজাল জাতীয় কার্যধারা, ইত্যাদি বিস্ময় ভাবের উদ্রেক করে।

শমভাব– শান্তরস। মনের প্রসন্নতা ও একাগ্র ভাব হল শমভাব।

স্নেহভাব– ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমত্ব, আদর ও ভালবাসাই হল স্নেহভাব।

এবার সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে কথা বলব। সাত্ত্বিকভাব হল স্বভাবগত বা মেজাজগত। সাত্ত্বিকভাব মনের মধ্যেই মনের অবস্থা বিশেষে গড়ে ওঠে। এটি সত্ত্ব-প্রকৃতিগত ভাব। সাত্ত্বিক ভাব হল ৮টি। স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু বা কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।

স্বেদ– ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, লজ্জা, পরিশ্রম, রোগ, তাপ, গ্রীষ্ম, ব্যায়াম, শ্রান্তি, মালিশ প্রভৃতি নানা কারণে স্বেদের জন্ম হয়।

স্তম্ভ– আনন্দ, ভয়, রোগ, বিস্ময়, বিবাদ, নেশা ও ক্রোধ থেকে স্তম্ভের জন্ম হয়। বিশেষত্ব হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা ও গতিহীনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমাঞ্চ– ভয়, ঠাণ্ডা, আনন্দ, ক্রোধ, রোগ, স্পর্শ ইত্যাদি রোমাঞ্চের জন্ম দেয়।

স্বরভেদ– ভয়, আনন্দ, ক্রোধ, জ্বর, রোগ, নেশা ইত্যাদি থেকে স্বরভেদ বা স্বর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

বেপথু বা কম্প– বেপথু বা কম্পনের কারণ ঠাণ্ডা লাগা, আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, প্রিয়জনের স্পর্শ ও বার্ধক্য।

অশ্রু– আনন্দে, দুঃখে, ধোঁয়ায়, ভয়ে, স্থির দৃষ্টিতে, ঠাণ্ডায়, রোগে, হাই ওঠাতে, কাজল পরা বা অবজ্ঞা মিশ্রিত ক্রোধে অশ্রু জাগে।

প্রলয়– অতিরিক্ত পরিশ্রম, নেশা, ঘুম, আঘাত, বিস্ময়, মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রলয় বা জ্ঞানহীনতার কারণ।

স্থায়ী ভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব ছাড়াও আছে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব।

বিভাব হল স্থায়ী ভাবগুলির উদ্বোধক। কারণ, নিমিত্ত বা হেতু। বিভাব হল দুই প্রকার ১. আলম্বন ও ২. উদ্দীপন।

আলম্বন– ভাব যাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ চরিত্র হল অবলম্বন বা আলম্বন। যেমন,– নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক ইত্যাদি। কারণ এদের অবলম্বন করেই রসের উৎপত্তি ঘটে।

উদ্দীপন–যা রসকে উদ্দীপ্ত করে তোলে তাই উদ্দীপন। যেমন অবলম্বনের চেষ্টা, বেশ, ভূষা, রূপ, দেশ, কাল, তপোবন, বীথিকা, কাকলি ইত্যাদি।

এবার অনুভাব। অনুভাব হল যে সক্রিয়তার সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। রসে প্রতিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ চরিত্রদের আচরণীয় সব কিছুই অনুভাব। অনুভাবের দ্বারা স্থায়ীভাব সহৃদয় দর্শকদের কাছে প্রকাশিত হয়। ছলনা, কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, হাস্য, বাহু ইত্যাদি হল অনুভাব। এক কথায় সাত্ত্বিক ভাব হল কারণ আর অনুভাব হল কার্য।

সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব–স্থিরভাবে বর্তমান 'রতি' প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের প্রতি বিবিধ প্রকারে অভিমুখভাবে চরণশীল ভাবের নাম ব্যভিচারী। এরা অস্থায়ী। অন্যকথায় যে ভাব নিজস্বতায় প্রকট না থেকে মূল ভাবকে ক্রমশঃ পুষ্ট করে তোলে ও নাটকের রস নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। এই পর্যায়ে ঘটনা একটি ভাব থেকে অন্যতর ভাবে অনায়াসে প্রবেশ করে আর তাদের মিলিত ফল মূল ভাবকে গড়ে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা ৩৩টি। এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. **অপস্মার**– অপস্মার ভাবের গূঢ় অর্থ অপদেবতার প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া।

২. **অবহিত্থা**– মনের আসল ভাবটি লুকানোর চেষ্টা।

৩. **অমর্ষ**– অপমানজনিত ক্রোধ বা অমর্ষের কারণ, তিরস্কার, অপমান।

৪. **অসূয়া**– নানারকম বিরোধিতা, অন্যকে ঘৃণা, অন্যের সম্পদ সৌভাগ্যে পীড়িত হওয়া, ঈর্ষা, বুদ্ধি ও শিক্ষার স্বল্পতার কারণে অসূয়া জন্মায়।

৫. **আবেগ**– এই ভাবের উৎপত্তির কারণ প্রচণ্ড ঝড়, প্রবল বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপর্যয়, হাতীর ছুটোছুটি, অত্যন্ত শুভ অথবা অশুভ সংবাদ প্রাপ্তি। বিরোধী আঘাত ও অন্যান্য।

৬. **আলস্য**– রোগভোগ, গর্ভধারণ, স্বভাবগত কুঁড়েমি, অবসন্নতা, পরিতৃপ্তি ইত্যাদিতে আলস্য ভাব দেখা দেয়।

৭. **উগ্রতা**–দস্যুকে গ্রেপ্তার করা, রাজদ্রোহ, আপত্তিকর কথাবার্তা প্রভৃতি উগ্রতার কারণ।

৮. **উন্মাদ**– প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পদহানি, আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, মানসিক বিশৃঙ্খলা উন্মাদ ভাবের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

৯. **ঔৎসুক্য**– বাগানদর্শন, প্রিয়বিচ্ছেদ, প্রিয়জনের জন্য বিরহ ইত্যাদিকেই ঔৎসুক্যের কারণ বলা হয়েছে।

১০. **গর্ব**– শিক্ষা, রাজত্ব, উচ্চকুলে জন্ম, যৌবন, ব্যক্তিগত রূপ-ঐশ্বর্য, ক্ষমতার অধিকার, সম্পদলাভ ইত্যাদি গর্বের কারণ।

১১. **গ্লানি**– মানসিক অশান্তি, দীর্ঘভ্রমণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অনিদ্রা, বমন, বিরেচন, রোগভোগ, উপবাস, আত্মনিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত করতে কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি থেকে গ্লানির জন্ম হয়।

১২. **চপলতা**– চপলতা ভাবের কারণ হিসেবে প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা, অধৈর্য, দ্বেষ, বিরোধিতা ইত্যাদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

১৩. চিন্তা–ধনহানি, চুরি, বিশেষ জিনিষ হারিয়ে যাওয়া, দারিদ্র্য বিভিন্ন কারণে চিন্তার জন্ম সম্ভব হয়। আশাভঙ্গেও চিন্তা ভাবের উদয় হয়ে থাকে।

১৪. **জড়তা**–নিশ্চুপ হয়ে থাকা জড়ত্বের অন্যতম লক্ষণ। চৈতন্য সক্রিয় থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। মানুষের এই অবস্থায় ভালমন্দ হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদির প্রভেদবোধ লুপ্ত হয়।

১৫. **দৈন্য**– দারিদ্র্য ও মানসিক অশান্তি থেকে দৈন্যের জন্ম হয়।

১৬. **ধৃতি**– ধৈর্য ভাব। ধৃতি ভাবের বিভাব হল বীরত্ব, ধর্মীয় ও আত্মিক জ্ঞান, সম্পদ, পবিত্রতা, সদাচার, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থপ্রাপ্তি, খেলাধুলা উপভোগ প্রভৃতি।

১৭. **নিদ্রা**– দুর্বলতা, ক্লান্তি, নেশা, অতিরিক্ত চিন্তা, ঘুমকাতুরে স্বভাব, অতিরিক্ত আহার প্রভৃতি নিদ্রা ভাবের কারণ।

১৮. **বিতর্ক**– সন্দেহ, অবগতি, হতবুদ্ধি প্রভৃতি বিতর্ক বা বিচক্ষণতার কারণ বিশেষ। বিভিন্ন ধরণের যুক্তিচিন্তা, মতপার্থক্য, বাদানুবাদ, তর্ক, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করা।

১৯. **বিরোধ**– বিরোধ বা জাগরণের কারণ, কুস্বপ্নদর্শন, হজম না হওয়া, জোরালো শব্দ, সুবেদী স্পর্শ ও অন্যান্য।

২০. **ব্যাধি**– বায়ু-পিত্ত-কফ প্রভৃতির আধিক্যে ও প্রভাবে ব্যাধি জন্মায়। জ্বর ইত্যাদি ব্যাধির বিশেষ লক্ষণ।

২১. **মতি**– বহুশাস্ত্রপাঠে যে জ্ঞান জন্মায় তাতে যে স্থির ভাব জাগে, তাকেই বলা হয়েছে মতি।

২২. **মদ**– নেশাগ্রস্ততা বা মদ অবস্থার কারণ মদ্যপান অথবা ওই জাতীয় নেশার জিনিষ খাওয়ায় যে মত্ততা।

২৩. **মরণ**– প্রাণের বিয়োগে মৃত্যু বা মরণ হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের উপক্রমজনিত ভাবই হল মরণ।

২৪. **মোহ**– মোহ অর্থাৎ হতবুদ্ধিতা বা চিত্তবিক্ষেপ, ভয় বিহ্বলতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

২৫. **লজ্জা বা ব্রীড়া**– সাধারণভাবে অনুচিত বা অযথাযথ কাজই ব্রীড়া বা লজ্জার মূল।

২৬. **শঙ্কা**– কোন কিছুতে ভয়-ভীতি, শঙ্কিত হওয়া, দ্বিধাগ্রস্ততা, কেঁপে ওঠা, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর শঙ্কা ভাবের কারণ।

২৭. **শ্রম**– দীর্ঘ পথশ্রম, ব্যায়াম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহারে শ্রমের উৎপত্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮. **সন্ত্রাস**–সন্ত্রাস বা ত্রস্ত ভাব ঝড় বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, উল্কাপাত, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের চিৎকার বা ডাক ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে।

২৯. **স্বপ্ন**– স্বপ্ন বা সুপ্ত ভাবের কারণ নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়া, কোন বিষয় নিয়ে বিমুগ্ধভাবে আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

৩০. **স্মৃতি**– সুখ দুঃখ সমস্ত অবস্থাতেই অতীতের আবর্ত বা স্মৃতি জাগে।

৩১. **হর্ষ**– হর্ষ বা আনন্দের কারণ– কাম্যবস্তু প্রাপ্তিতে মানসিক তৃপ্তি।

৩২. **বিষাদ**– আকস্মিক দুঃখ, বিপদ, রাজদ্রোহ, আরব্ধ কর্ম অসম্পন্ন থাকলে অথবা সফল না হলে বিষাদের কারণ হয়।

৩৩. **নির্বেদ**– বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্যসূচক ভাব। উদাসীনতা।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী আমরা যে এতগুলি ভাবের কথা উল্লেখ করেছি, এগুলি ভালো করে বুঝতে হবে এবং কণ্ঠে চর্চা করে আয়ত্তে আনতে হবে। ঘরে ব্যক্তি জীবনে আমরা নিজস্ব ভাব ও চিন্তা কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু নাটকের সংলাপ বলবার সময় সেসব ভাব কোথায় হারিয়ে যায়। কেমন মেকি বলে মনে হয়। কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। কারণ হল আমরা সংলাপের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি না। ভাবগুলি সনাক্ত করে বোঝবার চেষ্টা করি না, এবং অনুভব না করেই বলবার চেষ্টা করি।

ভাব, রস ও আবেগ অনুযায়ী বেশ কিছু নির্বাচিত কবিতা, গদ্যাংশ ও নাট্য সংলাপ অনুশীলনী হিসেবে দেয়া হলো। এই অংশগুলিতে বিভিন্ন রসের, ভাবের ও আবেগের সঞ্চার ঘটেছে। সেগুলি ঠিকমতো পড়ে, অর্থ বুঝে– ভাব, রস ও আবেগ-এর রঙগুলিকে কণ্ঠে ধারণ করে ঠিক স্বর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। অনুশীলনীগুলিতে কোনো রস, ভাব বা আবেগ আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। চর্চার মাধ্যমে এগুলি খুঁজে বের করে ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারাটাই অনুশীলনীর কাজ।

১. মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না,

আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে
আমার মৃত্যুর আগে বোলে যেতে চাই,
সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন
কি লাভ যুদ্ধ কোরে ? শত্রুতায় কি লাভ বলুন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধিপত্যে এত লোভ ? পত্রিকা তো কেবলি আপনাদের
ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস আর বিনাশের সংবাদে ভরপুর...
মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালোবাসা পেলুম
পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামলোনা।
পৃথিবীতে তবু আমার মতোন কেউ রাত জেগে
নুলো ভিখিরীর গান, দারিদ্রের এত অভিমান দেখলো না!

আমাদের জীবনের অর্ধেক সময় তো আমরা
সঙ্গমে আর সন্তান উৎপাদনে শেষ কোরে দিলাম,
সুধীবৃন্দ, তবু জীবনে কয়বার বলুন তো
আমরা আমাদের কাছে বোলতে পেরেছি,

ভালো আছি, খুব ভালো আছি ?

[জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন—আবুল হাসান]

২. হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

[হায় চিল—জীবনানন্দ দাশ]

৩. তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙ্গলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুরে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন—তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ, যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে—
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

(তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা—শামসুর রাহমান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. অপূর্ব কৃষ্ণ বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে। বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।...

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বর আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না সেই জন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীর ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী।... গ্রামের যত ছেলেদের সহিত ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই।...

(সমাপ্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫. এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ করস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া মরিতে পারে।

(দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৬. গোঁসাই — এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্বাদ করি, সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

[রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[প্রস্থান]

৭. নন্দিনী — ও কী, ওই-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ওই তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই! ওদের এমন দশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে করলে? ওই— যে দেখি শকলু, তলোয়ারখেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনু—প, শকলু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, বঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল ; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও বঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল! অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল!

[রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮. কোকিলা

মহামান্য আদালত, এতোক্ষণ যা শুনলেন তা কোনো আইনের পুস্তকের কথা নয়। কোনো পেনাল কোড নয়, এত নং ধারা এত নং উপ-ধারাও নয়। এটি নিছক একটি কবিতা। আজকের এই আদালতে আমি আমার বক্তব্য শুরুই করলাম বাঙ্গালী এক কবির কবিতা দিয়ে। নাটোরের নাম তো সবাই শুনেছেন। আমাদের রাজশাহীর নাটোর। বনলতা সেন সেই নাটোরেরই মেয়ে। যদিও কবি যে বনলতা সেনের কথা বলেছেন, আমার মামলার দুই মক্কেলের মধ্যে একজনও সে সবের ধারে কাছে নেই। তারা শুধুই কোকিলা। প্রথমজনও কোকিলা, দ্বিতীয়জনও কোকিলা। এমনকি আমি নিজেও এক কোকিলা।

মহামান্য আদালত, আজকের এই আদালত শুধুই কোকিলাদের আদালত। ধৈর্য ধরে আপনাদেরকে আমার মুখ থেকে শুধু তাদের কথাই শুনতে হবে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই মুখোস উন্মোচন হবে আজ। আদালতে উপস্থিত পুরুষেরা, মাপ করবেন, মহামান্য আদালত আপনি সমেত, কেননা দেখতে পাচ্ছি আপনিও একেজন পুরুষ, আপনারা সবাই যার যার পরিধেয় বস্ত্র সামনে রাখুন। কেননা যে কোনো মুহূর্তে আপনারা বিবস্ত্র হয়ে যেতে পারেন। কি হল ? একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ? ভাবছেন এক কোকিলা এসেছে দুই কোকিলার কথা বলতে। কোকিলারা তো সবাই মেয়েছেলে। তারা আবার কথা বলতে শিখলো কবে ? এই প্রশ্নের উত্তরটাই তাহলে প্রথমে দিচ্ছি। কোকিলারা মায়ের জাত। সন্তানের মুখে সবার আগে কথা গুঁজে দেন যিনি তিনিই মা। আপনারা যার যার মায়ের মুখটা স্মরণ করুন। তাহলে আমিও আমার কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারবো, আপনারাও শান্তিতে আমার কথা শুনতে পাবেন।

ঐ যে ওখানে, দাঁত কিড়মিড় করছেন, গোল গোল চোখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, অনুচ্চারিত কণ্ঠে আমাকে তিরস্কার করছেন, আপনি এই আদালত কক্ষ থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান। আই সে গেট আউট। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্টে হিয়ার। মহামান্য আদালত, এই দর্শকটি জন্মগতভাবে নারীবিদ্বেষী। আজ যেখানে চরমভাবে লাঞ্ছিত দু'জন নারীর তথাকথিত অপরাধের বিচার হবে সেখানে এই লোকটির থাকার কোনো অধিকার নেই। সে তার ভাব-ভঙ্গি দিয়ে আইনকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং আপনার প্রহরীদের বলুন লোকটাকে ঘাড় ধরে আদালত কক্ষ থেকে বের করে দিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্য সংলাপ বলার কৌশল

সংলাপ নিয়ে প্রাথমিক কাজ

সংলাপ নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমেই কণ্ঠ নিয়ে অতিরিক্ত সচেতন থাকা ত্যাগ করতে হবে। সংলাপ-এর লাইন শিখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে প্রথমে। কিন্তু শব্দ উচ্চারণ করতে হবে শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তা না হলে মঞ্চে শুধু খাঁড়া খাঁড়া দাঁড়িয়ে লাইন উচ্চারণ করা হবে। প্রথম প্রথম মঞ্চে অভিনয়ের সময় উত্তেজনায় ও আতঙ্কে লাইন আওড়াবার জন্যে একটা তড়িঘড়ি ভাব দেখা যায়। যে লাইনটি উচ্চারণ করছি— বলার আগেই লাইনের শেষটা মনে আসছে। ফলে লাইনটা দ্রুত হড়বড় করে বলা হয়ে যাচ্ছে। সংলাপের কোনো অভিব্যক্তি তৈরি হচ্ছে না তখন। অর্থাৎ কোনো একটি ক্রিয়ার সংলাপ-অভিব্যক্তি তৈরি হচ্ছে না। কখনও এমন মনে হয় যে, লাইনটা বলবার পরে তার ছবিটা (দৃশ্যকল্প বা অভিব্যক্তি) মানসপটে ভেসে উঠলো।

অবশ্য অভিনেতারা সবাই 'লাইন শেখার' কথাই সব সময় বলে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির জন্য সযত্ন পাণ্ডুলিপি (স্ক্রিপ্ট) পাঠের মাধ্যমে সংলাপ বোধগম্য এবং হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মহড়া-সময়ের বাইরেও অতিরিক্ত একান্ত সময় তৈরি করতে হবে। অভিনেতা নিজেকে তৈরি করার জন্য বেশ কিছু কায়দাকানুন ও পদ্ধতি তৈরি করে কাজ করেন। অবশ্য এসবের জন্য অনেক ধরনের পদ্ধতিই আছে। সব থেকে সহজ এবং অবশ্য করণীয় পদ্ধতি হলো, ছাপার অক্ষরে যেভাবে লাইনগুলি সাজানো আছে, তা একদম মুখস্থ করে নেয়া। অনেকে লাইনগুলি মুখস্থ করতে গিয়ে পৃষ্ঠার ডানদিকে নিচে এসে আর লাইন মনে করতে পারেন না, আবার অনেকে লাইন মুখস্থ করতে পৃষ্ঠার ছবিটা মানসপটে ভাসিয়ে তুলতে চান। ছাপার অক্ষরে সুবিধা এটাই যে চিন্তার এবং শব্দ সমষ্টির বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার মঞ্চে অভিনয়ের সময় মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেঁথে যায় এবং বদ্ধমূল হয়ে থাকে। প্রথমে লাইন মুখস্থ করার এটাই সুবিধা।

লাইন শিখতে শিখতেই লাইন-বলা শেখা হতে থাকে। মন টাইপ-এর চিহ্নগুলিকে শব্দের মধ্যে যে চিন্তা প্রোথিত আছে তার থেকেও আগে ক্রিয়ায় (action) রূপান্তর করতে পারে। যার কারণে মুখস্থ রেখে আমরা লাইনটা পুনরায় বলতে পারি। এই সুবিধাটা রয়েছে। যখন এরকম ঘটে, লাইনের মধ্যের চিন্তা ও ভাব স্রোতের মত ভেসে চলতে থাকে, সামান্য ও সাধারণ হয়ে ওঠে এবং আগেই ধারণাটা গড়ে ওঠে। মানুষ সাধারণত শব্দের মধ্য দিয়ে চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য নিরন্তর 'ঠিক' শব্দটি খুঁজে ফেরে এবং তাঁকে সংজ্ঞায়িত ক'রে ব্যাখ্যা করার ধারণা গড়ে তোলে। যখন স্বাভাবিকভাবে সংলাপ বলার মধ্যে এই চিন্তাভাবনা ঠিকভাবে কাজ করে না, তখন দর্শক সহানুভূতির চোখে সেই দৃশ্য উপভোগে অংশগ্রহণ করেন না। তখন সংলাপ যা বলা হয় তার শুধু আক্ষরিক অর্থই প্রকাশ করে। থিয়েটার তখন অপর্যাপ্তভাবে 'বলবার সাহিত্য' হয়ে ওঠে।

কারিগরি স্বর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সংলাপের লাইন স্রোতের মতো ভেসে চলে। এই সব পদ্ধতির মর্মমূলে একটা ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে; যদিও শুধু সুবিধার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সংলাপ শেখার পদ্ধতির সাথে এর মতপার্থক্য আছে। অভিনেতারা 'পঞ্জরাস্থি সংক্রান্ত রীতি'র শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতিতে তার পাঁজরকে দুলিয়ে ফুসফুসে অতিরিক্ত বাতাস সঞ্চয় করে। পঞ্জরাস্থি সংক্রান্ত রীতির শ্বাসগ্রহণ পেশিগুলিকে শক্ত করে এবং তা শ্বাসও নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সাথে পঞ্জরাস্থির ভিতরের পেশি এবং ডায়াফ্রামের ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু শ্বাসের নিয়ন্ত্রণের জন্য এটা স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতি পেশিকে নমনীয় ও শক্ত করতে সাহায্য করে। কিন্তু অভিনয়কালে এই পদ্ধতি কাজে লাগালে শরীরে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা (tension) দেখা দেয়। এর সাথে আরো একটি ধারণা চালু আছে যে ভোকাল কর্ডের মধ্য দিয়ে অনবরত ভেসে আসা বাতাসের মধ্য দিয়েই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অভিনয় মিথ্যে হয়েও মঞ্চের সত্য। রিহার্সেল দিয়ে তৈরি করা অভিনয় হয়েও স্বাভাবিক ও বিশ্বাস্য। এটাই অভিনয়ের প্রাণ। সেজন্য পার্ট এমনভাবে মুখস্থ করতে হয় যে মনেই হবে না অভিনেতা মুখস্থ থেকে পার্ট বলে যাচ্ছেন। অভিনেতা নাটকের চরিত্রের সত্য বাস্তবতা অন্তরের অনুভূতি দিয়ে বলেন, দর্শকও আপ্লুত হন। কিন্তু অভিনেতা মুখস্থ পার্টই আওড়াচ্ছেন সর্বদাই।

সংলাপের চলন (Movement in Speech)

সংলাপ বা বাচন চলনের মধ্য দিয়ে আমাদের শ্রুতিগ্রাহ্য হয়। অনেক রকম চলনের (movement) মধ্য দিয়ে একটি সংকেত তৈরির মাধ্যমে শ্রুতিকল্পমূর্তি তৈরি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংলাপ বা বাচন তৈরিতে প্রধান ভূমিকা নেয় শরীরের পেশিসমূহ। এই পেশিসমূহই আবার ফুসফুসের বায়ু প্রবাহ এবং নাক, মুখ ও গলবিলের কাজ 'নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো পেশি বা পেশিসমূহ আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে পারে না। সমতা রক্ষা এবং আঘাতের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যময় ধ্বনি তৈরিতে পুরো শরীর-যন্ত্র যুক্ত থাকে। গতিময় ফিডব্যাকের মাধ্যমে এই ধ্বনিকে শরীর-যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আসলে শরীরের এই চলনগুলি দেখা যায় না এবং বোঝাও যায় না। অদৃশ্যভাবে গতিময় অনুভবের মত বক্তা ও শ্রোতার মাঝে এই চলনগুলি অবস্থান করে। কেউ কেউ অভিনয়ে সংলাপের সাথে বড় ক'রে এবং খোলামেলাভাবে শরীরকে নড়াচড়া করান, বড় ক'রে এবং ধাক্কা দিয়ে ভঙ্গি তৈরি করেন।

সংলাপের সাথে শরীরের চলনের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়া সম্ভব। মহড়ায় অভিনেতা রাশছাড়া ভাবে এই অভ্যাস করলে এর জোরটা অনুভব করতে সমর্থ হবেন। পরে মুভমেন্ট প্রশিক্ষণের সময় কণ্ঠকে যুক্ত ক'রে, তার সমতা তৈরি ক'রে—নতুন এক মুভমেন্ট সৃষ্টি হবে।

কোনো কোনো স্বরচর্চা প্রশিক্ষণে 'মন আবিষ্ট করা' ধ্বনি সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্ক্রিপ্ট নিয়ে চর্চায় উচ্চমাত্রিক ব্যাখ্যা তৈরির প্রচেষ্টাও দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে প্রথমেই উঁচু মাপের 'ক্লাসিক টেক্স' নিয়ে কাজ করা উচিত নয়। তাহলে প্রথমেই শিক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাবেন। উচিত শক্ত 'স্ক্রিপ্ট' নিয়ে স্বরের প্রাথমিক চর্চা করা।

সব থেকে বড় সমস্যা অভিনয় পদ্ধতিতে চরিত্রের অন্তর্জীবন ও আন্তক্রিয়ায় মনোসংযোগ করা। সংলাপ-এর লাইন তৈরি করার সময় তার ভাব এবং আবেগ আন্তপ্রক্রিয়ায় কণ্ঠে ধারণ করতে হবে এবং যখনই একভাব থেকে অন্যভাবে রূপান্তরিত হবে, স্বরকেও সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বনি তৈরি করতে হবে। প্রতিটি লাইন এমনভাবে বলতে হবে যেন অন্তর্নিহিত অর্থটা প্রকাশ পায়। বাহ্য আবরণে সংলাপে যেটা খুঁজে পাওয়া যায় না—অভিনেতাকেই সেটা খুঁজে বের করে নিতে হয়। গতি ঠিক রাখতে হবে। নাটকীয় উদ্দেশ্য ও গতির সমতা রক্ষা করতে হবে। গতির এই উৎকর্ষ সংলাপের কল্পনাশক্তিপূর্ণ প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। নিয়মিত চর্চাতে এই অর্জন সম্ভব।

সংলাপের প্রত্যেকটি শব্দেরই নিজস্ব ওজন আছে এবং তার গুরুত্ব আছে। কোনো অভিনেতা যদি এই শব্দের গুরুত্ব ও ওজনের সমতা বিধান না করে নির্দিষ্ট চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা, নির্দিষ্ট ছবি থেকে অন্য ছবিতে যাতায়াত করেন, তাহলে শ্রোতার কাছে সংলাপের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। অভিনেতাকে দক্ষ সতঃসঞ্চরণশীল সমতা বিধানকারী হতে হবে। অত্যন্ত সহজেই এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা, এক ছবি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য ছবিতে দুলতে দুলতে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কোনো 'কাটা কাটা' ভাব বা ধাক্কা যেন না লাগে এই যাতায়াতের মধ্যে। সংলাপকে বিশ্লেষণ করে অভিনেতা খুঁজে বের করবেন সেই সব সংক্ষিপ্ততম মুহূর্ত, যার মাধ্যমে 'এক ভাব' থেকে 'অন্য ভাবে' লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া বা সেতুবন্ধন করা যায় অথবা এক সুর থেকে অন্য সুরে যাওয়া যায়।

সংলাপ বলার কৌশল

প্রথমেই কণ্ঠকে একটা যন্ত্রে পরিণত করতে হবে। সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র যেমন সঙ্গীত তৈরি করে, কণ্ঠকেও তেমনি যখন যেমন দরকার যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা যায় কি না, সেই চর্চাই করতে হবে। নাক, মুখ ও গলবিলের মাধ্যমে অনুরণনকারী স্বর উৎপাদন-যন্ত্র হিসেবেই কণ্ঠকে তৈরি করতে হবে। যত বেশি সচেতন সাড়-এর চলন হবে ততই অভিব্যক্তিমূলক ধ্বনি তৈরি হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেতা নিজে একজন যন্ত্রী এবং একই সাথে যন্ত্র।

প্রথমেই প্রয়োজন যন্ত্রকে সুরে বাঁধা। অভিনেতাকে জানতে হবে তার শরীর থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন ধ্বনির সীমা বা পরিধি কতটুকু।

ঘাড়ের মেরুদণ্ডের সামনে স্বরযন্ত্রের অবস্থানগত কারণে অভিব্যক্তিমূলক ধ্বনির সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্বরযন্ত্রকে উঁচু করে উঠিয়ে বললে অনুরণনমূলক গুণগত মানের স্বর সৃষ্টি হয়। স্বরযন্ত্রকে ঘাড়ের সন্ধি থেকে নামিয়ে দিলে গভীর, কৃষ্ণ-বাদামি রঙের স্বর তৈরি হবে। অধিকাংশ অভিনেতাই কখনও না কখনও অভিনয় মুহূর্ত এগিয়ে আসার সাথে সাথে তাদের শরীরে উত্তেজনার কারণে একধরনের টেনশন বা শরীর শক্ত হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনুভব করেছেন। অভিনেতারা প্রায়ই বলেন যে তারা কণ্ঠ নামিয়ে বলবেন। তারা সেইভাবে কণ্ঠকে স্বাভাবিক স্থানে স্থাপন করে। এটাই স্বরের কেন্দ্র।

কার্যক্ষেত্রে স্বর স্থাপনা কিভাবে করতে হবে এবং কেমনভাবে করতে হবে? হারমোনিয়ামে একটা 'নোট' ধরে বাজিয়ে অভিনেতাকে স্বাভাবিকভাবে স্বর উৎপাদন করার জন্য বলতে হবে—এইভাবে বাজিয়ে বাজিয়ে অভিনেতার স্বাভাবিক স্বরের কেন্দ্রটি খুঁজে বের করতে হবে। এই পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী পদ্ধতি। অভিনেতাকে নানা রকমভাবে বিভিন্ন স্থানে স্বর স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। যতক্ষণ না সে তার ইপ্সিত ও কাঙ্ক্ষিত এবং সব থেকে আরামদায়ক স্বর স্থাপনার স্থানটি খুঁজে না পাচ্ছে। জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার পর 'আ' করে ঐ নোটে গলাটা মেলাতে হবে এবং তারপর লম্বা সংলাপ বা কোনো কিছুর অংশ ওখান থেকে বলে যেতে হবে এবং একমাত্র একটি নোটেই। যখন অভিনেতা তার সঠিক স্বরকেন্দ্র খুঁজে পাবেন, তাকে জায়গাটা খুব ভালো করে চিনে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে নিজস্ব স্বরকেন্দ্রে যখন তখন ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

অনেক উঁচুতে এবং অনেক নিচুতে স্বরস্থাপনা— স্বরের পূর্ণ আওতায় যেতে বাধা প্রধান করে। স্বর-স্থাপনা ভুল স্থানে হলে শরীর ও মনে একধরনের প্রেরণাজাত প্রতিফলন ব্যবস্থা আপনাআপনিই অভিনেতাকে সুরেলা স্বরস্তরে নিয়ে আসবে। অভিনেতার স্বরকে উঁচু ও নিচু স্বরস্থানে যেতে বাধা দেবে। কেননা অনেক উঁচুতে ও অনেক নিচুতে স্বরের সমতা রক্ষা পায় না। যাইহোক, এই সহজ প্রবৃত্তিজাত কার্যকারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত বিষয় ও অর্থ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, ততক্ষণে ফলদায়ক নয়। যখন ঘটবে, দেখা যাবে অভিনেতা হঠাৎ করে ঊর্ধ্ব বা সমান আনতি (inflexion) ব্যবহার করছে। কিন্তু সেখানে হয়তো নিম্ন আনতি বা এই ধরনের কিছু একটা ধ্বনি সৃষ্টি করা উচিত ছিল। জড়তা কাটাবার জন্য অভিনেতা সচেতনভাবে গলায় জোর প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু দেখা যায় সেই ধ্বনি দুর্বল ও শক্ত।

স্বরকে কিছুটা উপরে ও নিচে নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে সমতা রাখতে হবে। স্বর সুরেলা স্বরস্তরে তখনই ফিরে আসবে যখন স্বর থাকবে স্বরের কেন্দ্রে। শরীরকেও সমতাপূর্ণ অবস্থানে রাখতে হবে।

অভিনেতা যখন একটা বড় সংলাপ নিয়ে অভিনয় চর্চা করেন তখন দেখা যায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন বাক্য, চিন্তা বা লাইন শুরু করছে অভিনেতা ঠিক আগের শেষ করা স্বরস্তর বা পিচ্ থেকে। আমাদের অভিনেতাদের একধরনের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় সহ-অভিনেতার বলে যাওয়া সংলাপের শেষ শব্দের রেশ ও স্বরস্তর এবং ছন্দ-স্পন্দন অনুযায়ী সংলাপ বলার প্রতি। এই ধরনের প্রবণতা অভিনেতার স্বরের সমতাকে ওলট-পালট করে দেয়। এতে অভিনেতার স্বর সঙ্গীতের বিস্তৃত স্বরসীমায় ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ভুল জায়গায় স্বর স্থাপন করলে তাকে ঠিক করারও একটা সমাধান সূত্র আছে। শরীরের ও কণ্ঠের মাধ্যমে খুব উঁচুতে স্বর স্থাপনা ক'রেও তাকে সংলাপ বলার মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা যায়। স্বরকে খুব নিচুতে স্থাপন করতে হবে। মনে হবে ঠিকই সংলাপ বলবার ধারায় সে ফিরে এসেছে।

বাচন একটি ক্রমাগত প্রবহমান জমানো ও ছড়ানো বেগ বা (Gathered & Scattered impulses) গতিময় প্রেরণা। বাচনের ক্ষেত্রে কখনও জমানো বেগ, কখনও ছড়ানো বেগ বেশি করে কাজ করে থাকে। সে কারণে লাইন বলতে গিয়ে মূল চাপটা পড়ে জমানো বা ছড়ানো কোনো একটা বেগ-এর উপর।

বড় প্রেক্ষাগৃহে শেষ সারির আসন পর্যন্ত কণ্ঠকে ঠেলে বা প্রক্ষেপণ করেও শ্রুতিগ্রাহ্য করা বড়ই কঠিন। প্রেক্ষাগৃহের শেষ আসনকে নিজের দিকে মনোযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে রাখতে হয়। এ ব্যাপারে জমানো বেগ, ছড়ানো বেগ-এর থেকেও পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে বাচনে। একজন অভিনেতা যে জমানো বেগসহ নরমভাবে বলে, তার কণ্ঠস্বর কম প্রচেষ্টায় আরো পরিষ্কার শোনা যাবে, অন্য অভিনেতা যে চিৎকার করে বলছে তার থেকেও। স্বর উৎপাদনের সময় স্বরের সব যন্ত্রপাতির পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমেই এই অর্জন সম্ভব।

বাস্তবধর্মী চেষ্টা বা বারবার ভুল করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া যে অভিনেতারা শেখে নি, তারা কিছু নির্দিষ্ট ফাঁদে পড়েন। লাইন বলার সময় বা স্বর প্রক্ষেপণের সময় তারা ছড়ানো বেগকে কর্তৃত্ব করতে দিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটান এবং শোধরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে লাইন বা বাক্যের শেষে ভীষণ বড় করে জমানো বেগ তৈরি করে। যখন তারা প্রথামতো শ্বাস গ্রহণ করে। কথিত আছে ইতালির বেল ক্যান্টো অপেরা গায়করা অনেক উঁচুতে উদাত্ত স্বরে গান গাইতে পারে। গান গাইবার সময়ে ঠোঁটের থেকে এক ইঞ্চি দূরে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা থাকলেও, শিখা একচুলও কাঁপে না। অভিনেতাদের জন্য এই পদ্ধতি খুবই শক্ত ও কঠিন। কিন্তু শ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর এবং ভালো অভ্যাস।

কিছু নির্দিষ্ট পদসমষ্টিকে ভাগাভাগি করে যদি বলা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত জমানো বেগ ব্যবহৃত হয়। এতে ভাষার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। জমানো ও ছড়ানো বেগকে লাইনের শেষ পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট-এর অঙ্গীভূত ক্রিয়া অনুযায়ী পালাক্রমে ব্যবহার করতে হবে। অবিরামভাবে পালাক্রমে এই কাজ ঘটলে এক ধরনের আপনি আপনি ছোট ছোট প্রতিবর্তী শ্বাস সমস্ত লাইন ধরেই তৈরি হবে। শ্বাস তখন ছাপিয়ে ওঠে। এই শ্বাস বাস্তবে জমিয়ে রাখা শ্বাসকে বড় সংলাপ বা অনুচ্ছেদ বলতে সাহায্য করে এবং 'পাঁজর-সংক্রান্ত রীতির' মতো অনাবশ্যক এক কৃত্রিম শ্বাস গ্রহণ পদ্ধতি তৈরি করে।

বাচনে যে অভিনেতার সমস্যা আছে, তার জন্য প্রথম 'বেগ' বা 'প্রেরণা'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপের বিষয় ও ঘটনার ওপর নির্ভর করে, প্রথম বেগটি জমানো না ছড়ানো বেগ হবে। যাই হোক, যদি অভিনেতা চর্চা ও ব্যবহারের মাধ্যমে জমানো বেগ ব্যবহারে অভ্যস্ত হন, তা হলে প্রথম জমানো বেগ লাইনকে তার কাছ পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে যদি দ্বিতীয় জমানো বেগও ব্যবহার করা হয়, তাহলে অভিনেতা সংলাপ কোনো জায়গায় থামা না পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এই সময়ে অভিনেতা মাঝের সমতায় ফিরে আসার ভীষণ প্রয়োজন বোধ করে। নতুন অভিনেতার ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। লাইনকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং শরীরও কেন্দ্র থেকে সামনে চলে আসে। অভিনেতা প্রথম বেগকে রাশ টেনে নিয়ন্ত্রণে আনবেন এবং জমানো বেগ তৈরি করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অভিনেতার যদি ছড়ানো বেগ-এর ওপর কর্তৃত্ব থাকে অথবা প্রায়শ ব্যবহার করেন, তবে জমানো বেগ-এর উপর তার কাজ করা উচিত। চেষ্টাকৃত শিথিলীকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সেই অভিনেতার কাছে ছড়ানো বেগ আছে। ভিতরে বাইরে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আয়ত্তে আনতে পারলে অভিনেতা খুবই নিশ্চিন্তে সংলাপের পিঠে চড়তে পারবেন এবং তিনি যা বলছেন তার সমতাও রাখতে পারবেন। মুখ দিয়ে সংলাপ বলা হচ্ছে ভুলে গিয়ে মনে করতে হবে সংলাপ পিছন দিয়ে বলা হচ্ছে। তাহলে অভিনেতা সংলাপ বা বাচনের ঘাড়ে চড়তে পারবেন। ধ্বনির অনুরণনের জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার না করে, কল্পনার মধ্য দিয়ে অভ্যাস করিয়ে সঠিক ধ্বনি তৈরি করতে পারবেন।

সংবেদনের গভীরতা (Depth of Sensation)

অভিনেতার প্রাথমিক একটা কাজ হলো কেন্দ্রীয় সমতা ও নমনীয় সংবেদন তৈরি করা, যাতে অভিনেতা সঠিক সমতাপূর্ণ অবস্থান থেকে কাজ শুরু করতে পারেন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকে মাথা, ঘাড়, মেরুদণ্ড, পেলভিস-এর সঠিক সম্পর্ক এবং উত্তেজনায় বিশেষ করে শরীরের এই সব অঙ্গের অসমন্বয় মেরুদণ্ডের সোপানে এসে থামবে। অর্থাৎ ওপর শরীর কেন্দ্র তার প্রাথমিক সন্ধির ওপর। পেলভিস-এর ওপরের অংশ শরীরের সমতল কেন্দ্রের বিপরীতে অবস্থান করে। যখন পুরো শরীরের লাইন খাড়া কেন্দ্রের সুবিধাজনক লাইনের কাছাকাছি থাকে। কান থেকে শুরু করে

চিত্র ২৯

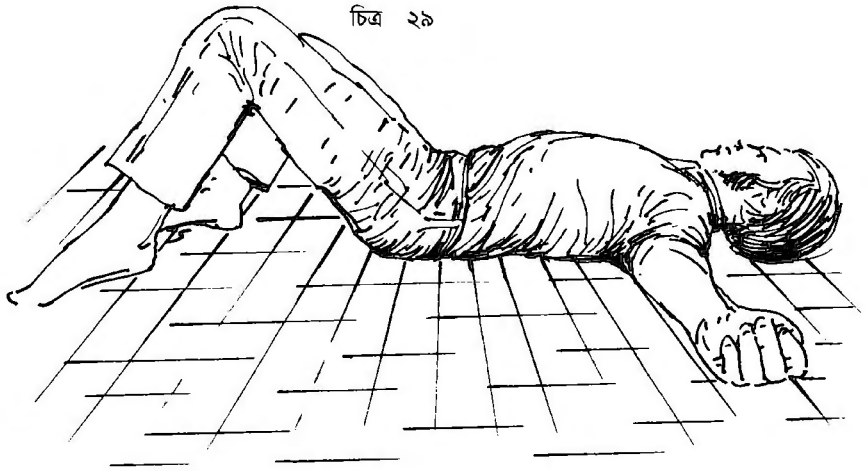

অভিনেতাকে চিৎ হয়ে মেঝেতে শুতে বলা হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকা নিয়েই সংবেদনের চর্চা করা যেতে পারে। মহড়া এবং প্রদর্শনীতে এই সংবেদন বা চেতনা সাহায্য করে। সংবেদনশীলতায় আরো বেশি সচলতার যখন প্রয়োজন সচেতনভাবে বোধের সমতা রাখা কষ্টসাধ্য। অনুশীলনী অভিনেতা চিত হয়ে হাঁটু দুটো উপরের দিকে রেখে শুয়ে পড়বেন। পেছনের পেশি ছড়ানো ও শিথিল থাকবে। এবার পেশিগুলি মেঝের সহযোগে আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। পেলভিসকে সামনে ঘুরিয়ে উর্ধ্বমুখী করে রাখতে হবে। পেছনের যে ফাঁকা জায়গাগুলি আছে সেগুলিকে মেঝের সমতলে মিশিয়ে নিতে হবে। ঘাড় লম্বা করে রাখা প্রয়োজনীয়। পিছন দিকে যেন ঘাড় ছোট হয়ে না যায় বা পেশিচাপ বেশি টানটান করে রাখা না হয়।

আরো দুটো পদ্ধতি আছে। শায়িত অবস্থার সংবেদনশীলতাকে বসা অবস্থাতেও করা যায়। অভিনেতাকে একটা চেয়ারে খাড়া করে বসিয়ে দিয়ে এবং পেলভিস না সরিয়ে এটাকে গড়িয়ে দিতে হয়। তার আসন চেয়ারের অধিকাংশ জায়গা দখল করে। চেয়ারের পেছনটা মেরুদণ্ডের যে জায়গাটায় পেলভিস বেরিয়ে এসেছে, সেখানে হেলানে সহায়তা দেয়। সমতার জন্য মেরুদণ্ড অহেতুক টান বা চাপ থেকে শক্তভাবে ঠেকনো দেয়। নিতম্ব সন্ধি সর্বাধিক শিথিলতার জন্য যেন খোলা থাকে এবং পা যেন হাঁটু থেকে গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত সরাসরি সোজা থাকে।

শেষ পদ্ধতি : পা ফাঁক করে অভিনেতা নিতম্ব সন্ধি থেকে বেঁকিয়ে দাঁড়াবে। নিতম্ব

চিত্র ৩০

কোমর থেকে স্বাভাবিক ভাবে শরীর ঝুলিয়ে দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধি যতটা খুলে চাপ টান না দিয়ে যাওয়া যায় ততটা যেতে হবে। আঙুলগুলো কুঁচকির উপরে রাখতে হবে। সমতল কেন্দ্রের সমান্তরাল করে রাখতে হবে। এবার ঝুলিয়ে দেবে আঙুলগুলি।

শরীরের উর্ধ্বাংশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উত্তেজনায়, সংলাপের শব্দের মধ্যের চিন্তা ও ছবিগুলি পেশিগুলি মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। ভেতরকার সংবেদনশক্তি জড়তামুক্ত এবং শক্তিশালী। এই সংবেদন শক্তি পুরো টর্সো থেকে অন্ত্রনালি পর্যন্ত মুক্তভাবে ও অনুনাদসহ চলাচল করতে পারে। এই সংবেদনশক্তি সম্পর্কে অভিনেতা একবার সচেতনতা প্রাপ্ত হলে, অনুপযোগী পরিবেশে ও স্থানে অভিনেতাকে মহড়া বা প্রদর্শনী চলাকালে শারীরিক দক্ষতার সাথে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে অবশ্যই।

বাচনের দিক পরিবর্তন

শরীরের নড়াচড়ার কারণে বাচনের উৎপত্তি ঘটে। কোনো একটি ক্ষেত্রে বা জায়গায় শরীরের ওজনের সমতার স্থানান্তরের কারণেই সব মুভমেন্ট তৈরি হয়। বাচনের উৎপত্তি ঘটে এবং ক্ষেত্রগত মাত্রা থাকে। চিন্তার দিক পরিবর্তনকে জায়গায় বা ক্ষেত্রে দিক পরিবর্তন বলা যেতে পারে। বাচনের ক্ষেত্রগত মুভমেন্টের ধরন সাধারণ বাচনেও পরিষ্কার দেখা যায়। এই মুভমেন্টগুলিকে যথার্থ করে তুলতে হবে। শরীরের সমতার আপাত অল্প পরিবর্তনই শরীরের মুভমেন্টের অর্থ প্রকাশ করে। এইভাবে অভিনেতা সংলাপের বিষয়গত দিককে মঞ্চের বাচনের রূপে অবলোকন করেন। এবং সুন্দর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কমিয়ে অভিনয়ের মাত্রার সমান অবস্থায় নিয়ে আসেন। এই চর্চার উদ্দেশ্য এই যে অভিনেতা কোনো এক আয়তনে বা ক্ষেত্রে যাতে ৩৬০° ডিগ্রী আয়তনে বাচন প্রক্ষেপ করতে পারেন। ঐ ক্ষেত্রের সবদিকে ঘুরে, শরীরের নড়াচড়ার মাধ্যমে এই ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এই চর্চাটি বাচনের সুষ্ঠু সুন্দর চলাচলে ও যোগাযোগে সহায়তা করে। বাচনের চিন্তার ধরনকে আয়তনিক ক্ষেত্রে রূপান্তর করতে পারা একটি জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজ।

অভিনেতা দীর্ঘদিনের অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে স্বরের গুণগত মানকে এক উন্নত স্তরে উন্নীত করতে পারেন। দীর্ঘ অনুশীলনে স্বরের একটা চরিত্র ও মেজাজ তৈরি হয়। অধিকাংশ নির্দেশকই সব ধরনের চরিত্রের মেজাজ অনুযায়ী যারা (অভিনেতা) কণ্ঠকে তৈরি করেছেন, কেবল তাদেরকেই অভিনয়ের বিভিন্ন চরিত্রে নির্বাচন করেন।

বাচনের বিভিন্ন উপাদান যেমন, স্বরের স্বচ্ছতা, উচ্চারণ, ধ্বনি তৈরির ক্ষমতা (সময়), আনতি, প্রক্ষেপণ ইত্যাদি বাচিক অভিনয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য আবশ্যক। বাচনের মন্থরতা ও গতি চরিত্র-চিত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মন্থর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচন এক ধরনের আলস্য, দুর্বলতা, অসুস্থতার পরিচায়ক, সেখানে গতিময় বাচন উদ্দীপ্ততা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

বাচনে আনতি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ করা হয়। বিস্ময়, বিরক্তি, অহঙ্কার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়া সচরাচর 'স্বরের টোনে'র মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আনতির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাচনের অর্থেরও পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। পিচের তারতম্য ঘটিয়ে আঞ্চলিক বা উপভাষারও-বা স্বচ্ছতা আনা যেতে পারে।

স্বর ও বাচন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে স্বর প্রক্ষেপণের উপর খুবই নজর দিতে হবে। কেননা দর্শকের কাছে শব্দ পরিষ্কারভাবে না পৌঁছলে নাটকও সার্থক হবে না। আঞ্চলিক ভাষাকেও দর্শকের বুঝবার জন্য কখনও কখনও সুবোধ্য রূপে পরিবেশন করতে হবে। কোন কোন অভিনেতা বেশি স্বাভাবিক অভিনয় করবার জন্য অস্পষ্ট উচ্চারণও করে থাকেন। এটা ঠিক নয়।

স্বর ও বাচনে বৈচিত্র আনতে হবে। সব লাইন একই গতিতে এবং একই আবেগে প্রক্ষেপ করলে তা অত্যন্ত বিরক্তিকর হবে। একটা নাটকের প্রত্যেকটা দৃশ্যের একটা নির্দিষ্ট গড় গতি ও আবেগময়তা আছে। দৃশ্যের এই প্রধান মূল সুরকে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভাঙতে হবে। বৈচিত্র্য আনার জন্য নানান ধরনের উপায় আছে। সব থেকে কাজের পদ্ধতি হলো বৈপরীত্য আনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে চরিত্র উচ্চগ্রামে, দ্রুত এবং আবেগপূর্ণ সংলাপ বলেছে—কিছুক্ষণ থেমে শান্ত, ধীর ও নিয়ন্ত্রিত স্বরে পরের লাইন বললে একটা বৈচিত্র্য তৈরি হবে। বিরতিকে এই কাজে চমৎকার ব্যবহার করা যায়। চিন্তা, আবেগ, গতি ইত্যাদির পরিবর্তনে বিরতির ভূমিকা খুব কার্যকর। বিরতিকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। দর্শক যাতে একাত্ম হতে পারে। বিরতির সময়ের হেরফের বা কম বেশি হলে অর্থ উল্টে যেতে পারে। বেশি বিরতি নিলে দর্শক ভাবতে পারে হয়তো লাইনই ভুলে গেছে। স্বর ও বাচনের অন্য উপাদান পিচ, স্বরপ্রাবল্য, মান, স্বচ্ছতা, উচ্চারণ, ধ্বনি ক্ষেপণের সময়সীমা ও আনতি— এদেরকেও এই বৈচিত্র্য আনার কাজে সার্থকভাবে কাজে লাগান যায়।

প্রত্যেক দৃশ্যের প্রধান চিন্তা-বোধ এবং আবেগ যেন স্বর ও বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়। কোনো কোনো চিন্তা-ভাবনা ও আবেগকে একটু বেশি চাপ দিতে হয় এবং অন্যগুলি একটু গৌণ থাকে। অভিনেতারা যখন চরিত্রের উদ্দেশ্য, অন্য চরিত্রের সাথে তার সম্পর্ক, প্রতিটা মূহর্তের গুরুত্ব ঐ দৃশ্যে অনুধাবন করতে না পারবেন ততক্ষণ এই লক্ষ্য অর্জিত হবে না। এইরকম অবস্থায় অভিনেতারা সঠিক জায়গায় যদি চাপ বা ঝোঁক দেন তাহলে কাজ হবে। তবে এর সাথে স্বরের তীব্রতা, আনতি ও 'কিছু শব্দ বা পদসমষ্টি একসাথে বলা' এগুলোও প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র অনুযায়ী স্বরের ও বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি ভীষণ জরুরি। কখনো অভিনয় দেখে মনে হতে পারে অভিনেতা ভুল স্বরস্থানের প্রয়োগে সংলাপ বলছেন এবং তা দর্শকের কাছে মোটেও বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। চরিত্র অনুধাবন করে ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উদ্দীপনার মাধ্যমে স্বর উৎপন্ন না হলেই এটি ঘটে থাকে। অতি অভিনয় ও খুব কম অভিনয় খারাপ। দৃশ্যের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এটা নির্ণয় করা যায়। আবার কখনও কখনও অভিনেতার স্বর কৃত্রিম এবং মুখস্থ থেকে বলছে, সেটা বোঝা যায়। এক্ষেত্রে একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অথবা কথাবার্তা বলার ভঙ্গিতে বাচন গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি স্বরের স্বচ্ছতা ও সমতা তৈরি করাও অভিনেতার কাজ।

নাটকের সংলাপ প্রস্তুতি বিষয়ে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ব্যায়ামের ও চর্চাগুলির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনে কাজ করলে সংলাপ বলার কৌশল রপ্ত করা যাবে। তবে সংলাপ বলার অনেক কিছুই নির্ভর করে নাট্যকারের ব্যাখ্যা, নির্দেশকের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা, নাটকের ফর্ম ও স্টাইল, মঞ্চ-পরিবেশ ও পরিস্থিতি। সহ-অভিনেতাদের অভিনয়ে সহযোগ দান ইত্যাদির ওপর। সংলাপচর্চার জন্য নির্বাচিত কয়েকটি নাটকের সংলাপের অংশ অনুশীলনের জন্যে উপস্থাপিত হলো।

১. ঔরংজীব :আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফকিরি কচ্ছি—

জাহানারা — স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে! বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক— তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে চলে যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না।

ঔরংজীব — মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা — দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্!

ঔরংজীব — মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ — মার্জ্জনা কর্ব্বেন পিতা! সে স্পর্দ্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত — বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্ব্বো না।

অন্য সকলে — কখনই না।

ঔরংজীব — সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি। নিজের ভগ্নীর—সম্রাট সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি। ভগ্নি অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা — তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যারূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিসহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এতবড় শাঠ্য আজ ধর্ম্মের নামে চলে' যাচ্ছে! আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেচে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব, মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নিজ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্ম-নীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব — আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্যাদা রক্ষা করুন।

[সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত]

জাহানারা — দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও। আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন!

সকলে — আজ্ঞা করুন।

জাহানারা — আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে! এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশি হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বলো! তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরাই ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলো সমস্বরে "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়।" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে — জয় সম্রাট, সাজাহানের জয়—

জাহানারা — উত্তম, তবে—

ঔরংজীব — (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম! সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে স্বাচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয় যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে' সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক্, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

[সকলে নিস্তব্ধ রহিল]

ঔরংজীব — এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখলাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশি দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন

আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়!

সকলে — জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব — উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্যাদা কর্ব্বেন না।

[ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

জাহানারা — ঔরংজীব!

ঔরংজীব — ভগ্নী!

জাহানারা — চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পার্চ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্গলো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি! চমৎকার!

ঔরংজীব — আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি যে আমি যতদিন সম্রাট্ আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাহানারা — আবার বলি—চমৎকার!

[সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

২.

[নন্দিনীর প্রবেশ]

নন্দিনী — পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশু আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী কেন।

বিশু যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী পাগলভাই, এই বদ্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুমভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া!
এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী বিশুপাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া'?

বিশু তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু কেন, রঞ্জনের কাছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দিনী — না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না—তার পরে কত কাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

৩. *মন্দির। বাহিরে ঝড়*
রঘুপতি
পুজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নতুন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী—
জয়সিংহে চাস তুই? আরে সর্বনাশী!
মহাপাতকিনী!

অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়।
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ। আছে আছে! ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।
রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

[বক্ষে ছুরি-বিদ্ধন]

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

[অপর্ণার মূর্ছা]

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

[বিসর্জন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৪.

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি-না কেন।

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না?

রাজা। কে বললে দেখতে পায়। মূঢ় যারা তারা মনে করে ' দেখতে পাচ্ছি'।

সুদর্শনা। তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না—তুমি বল কী! তুমি যে কত সুন্দর, কত আশ্চর্য, তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ঐ সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না, এ কী কথা!

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা। একরকম করে আসে বৈকি! নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা। কী রকম দেখেছ।

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার, শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ-ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব। আর, যদি না পারি, তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই-যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাত অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখেছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি, এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

রাজা। সে ভয়ে দোষ কী। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও। আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠ। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে, সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

৫.

বরকত	(নড়ে চড়ে) বলব বা কী আমি!
দয়াল	(কল্‌কে দিয়ে) আহা এ সম্বন্ধে তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের। (তামাক টানে) [নেপথ্যে—'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি]
বরকত	না সে তো ঠিক কথা—
নিরঞ্জন	তুমি যা ভেবেছ তাই বল। [নেপথ্যে খুব জোরে—'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি]
নিরঞ্জন	আরে ও মারা গেল কেডা! [নেপথ্য থেকে উত্তর আসে—'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।]
দিগম্বর	ত্রিলোচন মানে গে আমাদের নারানের বাপ! য়্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য।
সখীচরণ	হইছিল কী?
নিরঞ্জন	আবার হতে হয় নাকি কিছু!
বরকত	মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।
দয়াল	য়্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন, থাকল যারা তাদের নিয়েই হচ্ছে কথা। ধান যে ওদিকে সব পেকে ঝরে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।
ফকির	তারপর বরকত বল কী বলছিলে।
বরকত	কীই-বা বলব।
দিগম্বর	যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই! তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না!
সখীচরণ	হ্যাঁ, পাঁচজনে মিলে আলাপ-আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কী!
বরকত	মানে কথা হচ্ছে যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়; ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই-বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যাতে সঙ্গে এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি! অথচ এদিকে আবার এমনই অবস্থা—মাতব্বর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুই চার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকুল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল — এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত — হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্তে যখন খেই-ই পাচ্ছি নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্তে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর — আর এই অসুক বিসুখ; একেবারে জেরবার করে ফেল্লে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমায় তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে! মানুষ কি আর মানুষ আছে? না!

দয়াল — বুঝলাম, সব বুঝলাম; কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই, সঙ্গতি নেই, মন্বন্তরে একেবারে জ্বলে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ, নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

[নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য]

৬.

নেতা — কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তা ত ও দেখেছে। সকালবেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকালবেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিজ — আপনারা লিডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি-অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কি করতে হবে?

[স্তব্ধতা]

নেতা — ওটাকে শুদ্ধো পুঁতে দাও।

হাফিজ — এ্যা? কি বলছেন স্যার? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার! আর খাবেন না এখন।

নেতা — আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাত—যত নিচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে পুঁতে ফেল। কোনদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ — আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার! এসব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এজন্য অন্য রকম। কোন সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি, কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা — পুঁতে ফেল।

হাফিজ — ভুল, খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব কুল্‌লী করতে হবে। এসব আমাদের

রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা — যান, তাড়াতাড়ি যান! আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ — এ্যা। ওহ—হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক—কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাবো। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারবো। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যার?

নেতা — (চোখ তুলিয়া) আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। (গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)

[নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।]

ফকির — (হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া) ঝুঁটা। (হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)

নেতা — কে?

হাফিজ — এ্যাঁ! ওহ্! আপনি? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর!

ফকির — ঝুঁটা, মিথ্যাবাদী। আমাকে চিনতে পারে না এ-গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝ? দেখলে চিনতে পারবে?

হাফিজ — সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির — ঝুঁটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিচ্ছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠ চলে আসবে।

হাফিজ — আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন?

ফকির — বাবা! তোমরা শহরের অলিগলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারবো কেন?

হাফিজ — হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির — এই ত ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা! তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে। পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি।

হাফিজ — সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির — সাবাস বেটা! তোর নজর খুলছে।

হাফিজ — তা হুজুর এখন অনুমতি দিন ওদের পার করে দি!

ফকির — না! আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ির ভেতর গিয়ে উঠলাম!

নেতা — ইন্সপেক্টর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকির — প্রথমে দেখে মনে হলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্ত নেই, কোনটার ফাটা খুলি দিয়ে কি সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম, ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল-শকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাব করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দিখি—না ত, ঠিক ত নাই! উহুম!

হাফিজ — সে কি হুজুর! ঠিকই। সব ত ঠিকই আছে!

ফকির — চোপ রও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারি। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ — গন্ধ?

ফকির — বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন-এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ — ওহ! তাহলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির — ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ — খোদা হাফিজ!

[ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কি শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকিয়ে দেখে।]

ফকির — নাঃ আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি-(আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখচোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া) উহ! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কি ভুলই না করেছে!

নেতা — ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির — গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি কোরছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে-মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ এরকম ফাঁকি দেয় না! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস্! গোর-খুঁড়েরা কি ভুলই না করেছে! না, না, এত হতে পারে না—

[বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল]।

হাফিজ — হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার! আমরা এখন ফ্রি! দেখলেন তো, পাগলটাকে কি রকম পোষ মানালাম। পাগলাটাকে অত হুজুর হুজুর না বললে হয়ত গায়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা — ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ — ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার! তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক্ কথা বলে ফেলবো কিন্তু।

www.amarboi.com ~

নেতা — যেমন?

হাফিজ — যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেবো।

নেতা — মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিকমত উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কি করে?

হাফিজ — অনেক দিন হলো এ-লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা — সবটা ঠিক ধরতে পারেন নি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কি, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাফিজ — বিশ্বাস? হ্যাঁ পারবেন! তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারবো। তবে, তবে মানে এই চোখ আর কান খামোকাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা — ভয়? ভয় কিসের? তুমি মনে করেছো ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাবো! কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন-ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে।

[কবর-মুনীর চৌধুরী]

৭.

হাতেম আলী — পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীর সাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ কর। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে)। ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, ক'দিন বাঁচি না বাঁচি ঠিক নাই, যতদিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গেই থাক। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলবো, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তা-ই-বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ-কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিলো হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভিতর ঢুকবার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনাদের নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা ডোবা হবে? কিন্তু সে যাই হোক, আপনার যে শারীরিক কোন ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তাছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরায় স্থান দিতে পেরেছি, তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

বহিপীর — সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় তো এখনো পাইলাম না।

হাতেম আলী — আমার নাম হাতেম আলী। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিত জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলী। একটু অস্থির প্রকৃতির, কিন্তু খোদা চাহে তো মতিগতি ভালোই। সে যা হোক। ক'দিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। ভাবলাম শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না। যাক্, এসেছে ভালই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটি সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হলো?

বহিপীর — আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান।

একেক স্থানে একেক ঢঙ্গের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্যস্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কি করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা-কথাবার্তা কহিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তাছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোন ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

হাতেম আলী — আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীর সাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কী এই শহরেই আসছিলেন?

বহিপীর — (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈ কি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে যাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই হকিকুল্লাহ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিক করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বুঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন-বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই ইহাতে কোন গূঢ়তত্ত্ব আছে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছুটাছুটি করিতে পারি। বয়স তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদানা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হইবার জন্য লোকেরা দলে-দলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধন সম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায়ে ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোন অবসর দেয় নাই। এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাই নাই, কিন্তু সবই খোদার ইচ্ছা। তবে আমার দুঃখ এই যে, আমি মোজাহেদ হইতে পারিলাম না। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি। যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।

৮. [ইন্দ্রজিৎ কথা বললো না। লেখকের প্রবেশ। মৃদু হেসে বেঞ্চিতে বসলো ইন্দ্রজিতের পরে। অল্পক্ষণ নীরবতা।]

কমল — ক'টা বাজে রে?

ইন্দ্রজিৎ — সাড়ে বারোটা।

কমল — আপনাকে ক'টায় ডেকেছে?

লেখক — এগারোটায়। আমার আর একটা ইন্টারভিউ প'ড়ে গেলো আজকেই—সাড়ে দশটায়। এটার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম—একটা চান্স নিলাম আর কি?

কমল — ডাক পড়েনি তো?

লেখক — না, জোর পেয়ে গেছি!

কমল — লাক্ আছে আপনার!

[ভিতরে মূকাভিনয় শেষ ক'রে বিমল অন্যদিক দিয়ে চলে গেলো এর মধ্যে। ঘণ্টা। কমল ভিতরে গেলো।]

লেখক — সিগারেট?

ইন্দ্রজিৎ — আমি খাই না—থ্যাঙ্কস্।

লেখক — (সিগারেট ধরিয়ে) কি জিজ্ঞেস করছে—কিছু শুনলেন?

ইন্দ্রজিৎ — না, ওদিক দিয়ে বার ক'রে দিচ্ছে।

লেখক — তাই করে যুজুয়ালী। প্রশ্নের স্টক তো কম থাকে বেটাদের!

ইন্দ্রজিৎ — আপনার আগের ইন্টারভিউটা কেমন হলো?

লেখক — খুব সুবিধের হয় নি। হবে না বোধ হয়। চাকরিটা ভাল ছিল।

ইন্দ্রজিৎ — সেই জন্যেই বুঝি এটা ছেড়ে ঐটায় গিয়েছিলেন?

লেখক — হ্যাঁ, কিন্তু কি জানেন? পলিসিটা বোধ হয় ঠিক নয়। চাকরি পাওয়াটাই যখন বেশি দরকার তখন খারাপ চাকরিটার ইন্টারভিউ আগে দেওয়া উচিত। যেটার বেশি চান্স।

ইন্দ্রজিৎ — এখন তো দু'টোই হয়ে গেলো।

লেখক — সেটা লাকের ব্যাপার। না হ'লে এই আপসোসে তিনরাত ঘুম হতো না। চাকরি যে একটা কি ভীষণ দরকার আপনি জানেন না।

ইন্দ্রজিৎ — (হেসে) চাকরি তো সকলেরই দরকার।

লেখক — সে কথা একশোবার। মানে—জেন্যার্লি। কিন্তু আমার পার্টিকুলারলি—ব'লেই ফেলি আপনাকে। ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ফেলেছি ধার ক'রে। কম ভাড়ায় সুবিধেমতো ফ্ল্যাট তো ব'সে থাকবে না আমার জন্যে? এটার—আর কিছু না হোক—জলকলটা আলাদা।

ইন্দ্রজিৎ — বুঝলাম না ঠিক।

লেখক — মানে বিয়ে করছি আর কি। বাবার অমতে। চাকরি একটা এই মাসের ভিতরে না পেলে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে। বুঝছেন অবস্থাটা? ধার ক'রে আর ক'দিন বাড়ি ভাড়া গোনা যায়?

[কমলের শেষ হয়েছে। সে বাইরে গেছে। তারপর অমল-বিমল-কমল একসঙ্গে ফিরে তিনটি চেয়ার দখল ক'রে বসলো। জ্ঞানী-গুণী-বিচক্ষণ তিনটি ব্যক্তি। লেখকের কথা শেষ হ'তে অমল ঘণ্টা বাজালো। ইন্দ্রজিৎ ভিতরে গেলো। এবার আর একজনের মূকাভিনয় নয়। চেয়ার তিনটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—কণ্ঠে নয়, অঙ্গভঙ্গিতে। লেখক অল্পক্ষণ একা ব'সে সিগারেট খেলো। তারপর সিগারেট ফেলে সামনে এগিয়ে এলো।]

লেখক — অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে। তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ছেলে কমল চাকরি করে। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ঐখানে ফুটপাথে একটা সাত বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে কাঠের বাক্স, কোলে একটা এক বছরের ভাই। ঐখানে ফুটপাথে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার নাম লীলা। ঐদিকে আকাশে সিঁদুর রং। তার নিচে ব'সে মানসী জীবনকে ভালবাসতে চায়। অনেকগুলো জীবন। অনেক জানা অজানা অচেনা অজ্ঞতা আলো অন্ধকার। খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো অণু-পরমাণু সব যোগ ক'রে নাগরদোলার পরম আবর্তন।

[এবং ইন্দ্রজিৎ—বাদল সরকার]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.

মেথর   মাপ করবেন বাবু।

বেণি   ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর   কলকাতার গরীবদের বিষ্ঠা বাবুর গায়ে দিলাম।

বেণি   দেখুন, ওটা পড়তে পারছেন?

মেথর   পড়তে জানি না।

বেণি   ভাবছিলাম কেমন লেখা হয়েছে, সেটা—। আপনি থিয়েটার দেখেন?

মেথর   না।

বেণি   কেন?

মেথর   বুঝি না।

বেণি   দেখতে না গেলে কি করে জানেন বোঝেন না?

মেথর   আমি কলকাতার তলায় থাকি।

[ম্যানহোলের ভেতরে অংগুলি নির্দেশ করে]

বেণি   আপনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য পড়েছেন?

মেথর   কে সে?

বেণি   মহাকবি। দুই বৎসর হয় আমাদের সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। শুনুন—

বাধিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে
অম্বুরাশিসম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত, টংকারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী
রোধিল শ্রবণপথ। গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী,
পড়িল কুঞ্জর পুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জন বলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী, রণভূমি পুরিল ভৈরবে।

কেমন লাগল?

মেথর   জঘন্য।

বেণি   ঈশ। দেখুন, ঐ লুটিশে লেখা আছে ময়ূরবাহন নাটক আসিতেছে। আমার নাম বেণিমাধব চাটুয্যে, ওরফে কাপ্তেনবাবু। আমি বাংলার গ্যারিক। ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকা জানেন?

মেথর   না।

বেণি   সে পত্রিকা আমার এক্টো দেখে বলেছে, বাংলার গ্যারিক। কই গ্রেট নেশনেল থিয়েটারের অর্ধেন্দু মুস্তাফিকে তো বলেনি। যাক, আমি ঐ বেঙ্গল অপেরা দলের মাস্টার।

মেথর   আপনি চাটুয্যে বামুন?

বেণি   হ্যাঁ। *(মেথর আবার এক বালতি ময়লা সশব্দে ফেলে বেণিকে উত্ত্যক্ত করে)*

মেথর   বামুন বলে আরেকটু দিলাম।

বেণি   ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর   বামুন আর বাবু, দুই ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী।

[খানিক নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেণি হ্যাঁ, বাবু ভেয়েরা অমনি। আমি আগে যাত্রায় গাইতাম, বুঝলেন? তা শামবাজারের চক্কোত্তিবাবুদের বাড়ি বিদ্যাসুন্দর পালা হচ্ছিল। মেজোবাবু পাঁচ ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেছেন। আসরে মালিনী আর বিদ্যা—তোম বিদ্যাসুন্দর পালা কভি শুনা হ্যায়? ও আপনিতো বাঙালি—যাক, মালিনী আর বিদ্যে "মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ" গান করে মুঠো মুঠো প্যালা পাচ্ছে। বছর ষোলো বয়সের দুটো ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যামটা নাচছে, আর ওদিকে বাবুদের হাতে রূপোর গেলাসে ব্রান্ডি চলছে, বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে। ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো। মালিনী কাঁদতে কাঁদতে আসর সরগরম করে তুললো, বাবুর চমকা ভেঙে গেল, দেখলেন কোটাল মালিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এতে বাবু বড় রাগত হলেন। "কোন্ ব্যাটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়"—এই বলে রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। "বাপ" বলে কোটাল বসে পড়ল, আসর ভেঙে গেল। আমি সেজেছিলাম কোটাল। এই এইখানে লেগেছিল গেলাসটা—

[মেথর খানিক আগেই ম্যানহোলে ডুব দিয়েছিল। এবার বেণির হুঁশ হয় তিনি একা। শূন্যে হাতড়ে তিনি শ্রোতাকে খোঁজেন]

আরে? আজ বোধহয় বেশি টেনে ফেলেছি। পষ্ট দেখলাম এখানে।
(মেথর মাথা তোলে) এই তো! কোথায় গেসলেন?

মেথর যাবো আবার কাথায়?

বেণি ঠিক আছে, ঠিক আছে। (নীরবতা) আমি বামুন নই, দেখলেন? আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই। আমার নিমচাঁদ তো দেখেন নি। গিরিশ ঘোষের সাধ্য আছে অমন নিমচাঁদ করে? আর ঐ গ্রেট নেশনেলের বর্ণচোরা আমেরা কি করেছে জানেন? আমাদের একট্রেস মানদাসুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। গেরান জুরিতে এবডাকশনের কেস হয়। ঐ মানদাকে আমি গড়েছি নিজের হাতে। ছিল সোনাগাছির বেশ্যা। আমি তাকে নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি সাজাই। তিল তিল করি ক্রমে প্রস্ফুটিত কুসুমসম প্রকাশিল তিলোত্তমা। আর বেটি আজ গ্রেট নেশনেলে চলে গেল ড্যাঙস ড্যাঙস করে। এদিকে ময়ূরবাহন নাটক নামাই কি করে? অনুরাধার পার্টটা লেবে কে? আর ঐ যে দেখছেন লুটিশের তলায় বাবুর নাম—বীরকৃষ্ণ দাঁ—সে শালা যে ছ্যা-চ্যাংড়ার কেত্তন শুরু করে দেবে এসব জানতে পারলে। ব্যাটার ক অক্ষর গোমাংস, যেখানে যাবে পেছনে মোদাগাড়ি ভরা মালের বোতল চলে, সে শালা হলো স্বত্বাধিকারী। আর আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়। হায় মাতঃ এ ভবমণ্ডলে স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম এই দশা যদি পরে? অসহায় নর, কলুষ কুহকে পারে কি গো নিবারিতে? তাহলে আপনি নাটক দেখবেন না?

মেথর কেন দেখব? বেল পাকলে কাকের কি? বাবুর রোওয়াবি করবেন, বাজারের কসবি নিয়ে হলাহলি গলাগলি করবেন, আর এমন সব ভাষা বলবেন যা আমরা বুঝি না। (ময়লা ফেলে) তার চেয়ে বাইজীর খ্যামটা ভাল। আমাদের বস্তির রামলীলা ভাল। এই যে ময়ূর লাটক না কি বলছেন—এটা কি লিয়ে লেখা?

বেণি ময়ূরবাহন কাশ্মীরের যুবরাজ। গল্পটা হচ্ছে—

মেথর ধেত্তেরি যুবরাজ! মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পরে লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা-উজীর সাজো কেন? এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী করো কেন?

বেণি — টিনের তলোয়ার! ছেলেমানুষী?

মেথর — যা আছে তাই সাজো না। গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে দেখছো?

বেণি — ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর — সেটা দেখাতে নজ্জা হয় বুঝি? তাই চকচকে পোষাক পরে চৌগোঁপ্পা দাড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো। কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হেঁঃ চাটুজ্যে বামুনের জাত যাবে তাতে।

বেণি — ঈশ! এক এক বাক্য খরসান তরবারিসম বিঁধিছে বুকে।

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেনচূড় জলরাশি আসে কিরে ফিরে
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

মেথর — দেত্তেরি!

বেণি — ঠিক আছে, ঠিক আছে।

[টিনের তলোয়ার—উৎপল দত্ত]

১০.

মোড়ল — আমার অতীতের কথা শুনতে চাই না আমি। অনক আগেই তার আমি গোর দিয়েছি। তা দিয়ে কারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং শুনবো গৌরবদীপ্ত বর্তমানের, আশা-ভরা ভবিষ্যতের কথা।

উপেং — অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্ত শুধু।

আহাম্মদ — রাজী হও না কেন তুমি। ওর অতীতই শোনা যাক। জানার মধ্যে তো শুধু কয়েকটি কথা—জীবনের কয়েক লহমা দিশাহীনতার, কিছু আশা আর অসংখ্য নিরাশার। মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না। ত্যাগ স্বীকার করো। ত্যাগ স্বীকার করো, বৃহত্তর প্রতিফলের উদ্দেশ্যে।

মুনীর — হয়তো একটা ঘোড়া, একজন সওয়ার, আর অনন্ত অন্তহীন সূর্যাস্তের ছটা। ভাগ্যে তো এই।

উনেন — এই একমাত্র সুযোগ। আমাদের ভবিষ্যৎ জানতেই হবে আমাদের। আমি ওকে হত্যা করবো।

[মেয়েটি উন্মাদের মত হেসে ওঠে। পরিস্থিতি তড়িতস্পৃষ্ট যেন। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।]

উপেং — ক্রমেই ওর উপর ভর হচ্ছে, দ্যাখো। হে প্রভু, তোমার শাসন বিরাজে সর্ব ভূতে, সাধুসন্ত ও শয়তান নির্বিশেষে, সাগরে ও সমীরে, জীবন-মুখর এই দ্বীপে, যেখানেই তুমি হও, সহায় হও তুমি আমাদের। এই নিবেদিতাই একমাত্র আশা।

মুনীর — নিশ্চয়ই তার উপর ভর হয়েছে। দেহে তার এক দীপ্তি বোধ করছি যেন। এ যেন আমাকেও রাঙিয়ে তুলছে। কোন কিছুতে তেমন বিশ্বাস ছিল না আমার। আর এখন...এক গোছা কচুরীপানার মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছি যেন। বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার।

আহাম্মদ — আমি আত্মবিসর্জন দিতে রাজী। ঘৃণা ও লজ্জা সব কিছুই মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত। আমার অতীতের কথা বলতে দাও ওকে। নিজের অতীতকে আমি অস্বীকার করবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনেন ওকে নিয়েই শুরু করা যাক।

উপেং না, উনেন। মোড়ল বয়সে প্রবীণ। তার জীবন অনেক বেশি ঘটনাবহুল হবে। অতীতের কথা শুনতে সবারই ভালো লাগে। অনেক হালকা বোধ করবে সে।

মোড়ল এ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি। আমাকে নিয়ে এ রকম প্রদর্শনী করা চলবে না।

উপেং সাহস ধরো মোড়ল, সাহস ধরো। আমরা সবাই প্রবাল কীট। আমরা মরে যাবো আর আমাদের জৈব-শিলায় গড়ে উঠবে আরেক দ্বীপ। পুতুল আর পুতুল নাচিয়েরা নাচবে, গান গাইবে সেখানে, অনুরাগ-বিরাগে মাতবে। খুব অল্প লোকই গর্ব করত পারে এমন... হে নিবেদিতা, তুমি কি আমার কথা শুনছো... শুনতে পাচ্ছো তুমি। (মেয়েটি হাত দুটো একবার তুলে আরেকবার নামিয়ে এধার-ওধার দোলে নিমীলিত চোখে) মোড়লের অতীত আমাদের বলো। তাহলেই শুধু এরা বিশ্বাস করবে তোমাতে, নিজেদের এবং ভবিষ্যতে। (সে বিড় বিড় করতে শুরু করে)। দুর্ভিক্ষ, জরা, মহামারী, স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতদের হে প্রভু, সহায় হও তুমি তার, সহায় হও তুমি মানবতার।

[কালবেলা—সাঈদ আহমদ]

১১.

বাক্কা করলেন কি আপনেরা? করলেন কি? অ ত—

পুলিশ-১ চুপ থাক্ বজ্জাত। ঐ যে একটা দৌড় দিল—(দু'জন পুলিশই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণে ফাইটারের দেহ নিথর হয়ে গেছে। বাক্কা মিয়া গড়াতে গড়াতে আসে ফাইটারের মৃতদেহের কাছে। একটু আদর করে। ওর রক্ত হাতে মাখে বাক্কা। বাক্কা অভিভূত হয়ে যায়। ঠিক এমনি সময় ছুটতে ছুটতে আসে কাজী। এসেই পাঞ্জাবীর তলা থেকে একটা পিস্তল বার করে। এদিক-সেদিক তাকায়। তারপর পিস্তলটা বাক্কা মিয়ার কোলের কাছে ছুঁড়ে দেয়।)

কাজী বাক্কা মিয়া পিস্তলডা তুমার ঠ্যাং-এর চিপায় লুঙ্গির মইদ্যে গুইজ্জা রাখ। আমি আসতেছি। শালার পুলিশ, ক্যামনে যে ট্যার পাইলো।

[বলেই কাজী উল্টোদিকে দৌড় দেয়। বাক্কা মিয়া পিস্তলটা দেখতে থাকে]।

নেঃ পুলিশ-১ বাদবাকী পলাইছে। এইগুলারে লইয়া চলো। বাশডলা দিলেই সব খবর বাইর হইবো। উঠাও জীপে। চলো—

(বাঁশি বাজিয়ে জীপের শব্দ তুলে চলে যায় পুলিশ। বাক্কা মিয়া পিস্তলটা একটু লুকায়। কিন্তু হাত থেকে ফেলে না। পা টিপে টিপে আসে কাজী। একটু যেন নিশ্চিন্ত)।

কাজী যাক, এতোক্ষণ একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গ্যালো। আরেট্টু হইলেই আর্মস সহ ফাইসা গেছিলাম। (ফাইটারের পড়ে থাকা মৃতদেহটা দেখে)

কাজী আরে? এইডা কে? জাউরা হালার পো না? মরছে? অবশেষে নিমকহারামের বাচ্চার উচিত শিক্ষা হইছে। আরো একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি মন খারাপ কইরো না বাক্কা মিয়া। তুমার মাইয়ার কেইসটা যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এট্টু বেকায়দা হইয়া গ্যালো তথাপি তুমারে আমি ঠকামু না। তুমার মাইয়ার আমি বালো রেট দেমু। এক লম্বর। এক থোকে হাজার টেকা। মাইয়ারে তুমি কুনোভাবেই রাখতে পারতা না। অ' আমারে চিনা ফালাইছিলো। অরে বাইরে রাখলে যে ব্যবসার ক্ষতি হয়। মন খারাপ কইরো না। এইসব বস্তি মস্তির মাইয়াগো লিগা মন খারাপ করাডাও টাইম লস। যাইগা মিয়া—পুলিশের দাবরানিতে আইজকা বরই পেরাশানী হইলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্কা (পিস্তল উঁচিয়ে ধরে) খারান।
(কাজী ঘুরেই দেখে পিস্তল)

কাজী এই দ্যাখো পিস্তলডার কথা ভুইল্যাই গেছিলাম। এরেই কয় পুলিশের দাবরানি। পিস্তল ত পিস্তল, বাপের নাম পরযন্ত ভুলাইয়া দ্যায়। থ্যাংক ইউ বাক্কা মিয়া, তুমি আমারে পিস্তলের কথাডা মনে করাইয়া দিছো। আমি কাইলকাই তুমার মাইয়ার দামডা দিয়া যামু। (পিস্তলের জন্য হাত বাড়ায়) যাই অহন—

বাক্কা (মাথা নাড়িয়ে অদ্ভুতভাবে) না—

কাজী পিস্তল দিবা না?

বাক্কা (সেই একইভাবে মাথা নাড়িয়ে) না—

কাজী ও, জামানত হিসাবে রাইখা দিতে চাও? তুমার মাইয়ার দামের জামানত?

বাক্কা কুত্তার বাচ্চা। (কাজী লাফ দিয়ে সরে আসে)

কাজী কি? কি করতে চাও তুমি বাক্কা মিয়া? আমার পিস্তল আমারে দিবা না?

বাক্কা দিমু। তয় পিস্তল না গুল্লী।

কাজী তু-তুমি আমারে গুল্লী করবা। আহ্হা আমার আগেই বুঝা উচিত আছিল। ক্যান্ বুঝলাম না? (নিজের গালে নিজেই চড় মারতে মারতে) ক্যান্ ক্যান্ ক্যান্? এই সময় বাক্কার পেছনে পা টিপে ঢোকে কাজীর চেলা-১। কাজী দেখতে পায় কিন্তু বাক্কাকে বোঝার কোনো সুযোগ দেয় না।)

কাজী আমার গুল্লীই খাওন উচিত। আমি জালিম। তুমার উপর জুলুম করছি। আমি বদমাইস। তুমার মাইয়ার ইজ্জত মারছি। আমি কিছুতেই মাপ পাইতে পারি না।

বাক্কা কাজী আবদুল মালেক, তৈরি হইয়া যাও।

(এক ঝটকায় পেছন থেকে কাজীর চেলা-১ পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয় বাক্কার হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বমূর্তি ধারণ করে কাজী। লাফ দিয়ে এসে বাক্কাকে লাথি মারে।)

কাজী শালা কমুনিস্ট। বজ্জাত লুলা। কাজী আবদুল মালেকের সিনায় গুল্লী মারতে চায়? মার শালারে মার। (চেলা-১ কে গুঁতো দেয়) পিস্তলের চ্যাম্বারে যত গুল্লী আছে ব্যাবাক খরচা কর। আইজকা আমি দিল্ দরিয়া—খরচা কর ব্যাবাক গুল্লী—

চেলা-১ কুত্তা বিলাই মারতে এক গুল্লীর বেশি খরচা কল্লে ব্যবসার ক্ষতি হবে কাজী সাব।

কাজী জলদি কর। জলদি কর।
(চেলা-১ বাক্কার বুকের একটুখানি উপরে পিস্তল বাগিয়ে ধরে।)

চেলা-১ ক' কি তর শ্যাষ খায়েস? ক' জলদি। কি? শ্যাষ খায়েস কি?

বাক্কা আমি—আমি ফেরৎ চাই—

চেলা-১ কি ফেরৎ চাস?

বাক্কা আমি আমার মাইয়া ফেরৎ চাই—বউ ফেরৎ চাই—আমার মারে ফেরৎ চাই, বাপেরে ফেরৎ চাই, দাদারে ফেরৎ চাই।
(পিস্তল বাক্কার বুকের দিকে একটু নামে)

চেলা-১ আর? আর কি চাস?

বাক্কা আমি আমার জমি, লাঙ্গল, জুয়াল, হাল, গরু, কোদাল, খন্তা, শাবল, নৌকা, জাল সব সব ফেরৎ চাই। (পিস্তল বাক্কার বুকের দিকে আরেকটু নামে।)

চেলা-১ আর? আর কি?

বাক্কা আমি আমার ঘর, বারী, ভিটা ফেরৎ চাই। আমার বাপ দাদার ভিটা ফেরৎ চাই। আমার হাত ফেরৎ চাই। পাও ফেরৎ চাই। আমি আমার জিন্দেগী ফেরৎ চাই।

চেলা-১ এইবার ল', এক লগে তরে সব ফিরাইয়া দিলাম। (পিস্তল বুকে ঠেকিয়ে গুলি

করে। গুলির প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আলোর পরিবর্তন। এখন থেকে বাক্কার মৃত্যু পর্যন্ত পুরোপুরি কাল্পনিক একটি দৃশ্যের অভিনয় হবে চলচ্চিত্রের স্লো মোশানের ভঙ্গীতে। এ জন্য আলোর এবং শব্দের বিশেষ পরিকল্পনা করতে হবে। গুলির শব্দের পরপরই বাক্কা বাঘের মত গর্জন করে স্লো মোশানে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত লাফিয়ে পড়বে কাজী ও চেলা-১ এর ওপর। কাজী ও চেলা-১ স্লো মোশানে ধরা পড়বে বাক্কার কাছে। বাক্কা দু'জনকে দুই বগলের নিচে চেপে ধরে।)

বাক্কা (স্লো মোশানে লাফিয়ে উঠে) লেম্বু (চেলা-১ এক বগলে) পচা লেম্বু (কাজী আরেক বগলে) বারে বারে কি আমিই গুল্লী খামুরে? একবার ঠ্যাং-এ, একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে? (বলেই চাপ দিতে শুরু করে দু'জনকে) শালারা জানস, জানস তরা আসলে কি? লেম্বু—পচা লেম্বু (চাপতেই থাকে) তগ মতন পচা লেম্বুতে এই দ্যাশ ভইরা গ্যাছে। অহনে তগো লেম্বুচিপা দিয়া খতম করতে হইবো। লেম্বুচিপা, একমাত্র পথ। এ্যাম্‌নে এ্যাম্‌নে— (শেষ শক্তি দিয়ে বাক্কা দু'জনকে এমনই চাপ দেয় যে দু'জনের দম বন্ধ হয়ে আসে। ততক্ষণে বাক্কারও মরণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বাক্কা ঐ স্লো মোশানে টলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজী ও চেলা-১ এর মৃতদেহ দু'দিকে ছিটকে পড়ে। এটাও স্লো মোশানে। এখানেই কাল্পনিক দৃশ্যের সমাপ্তি। আমরা এবার বাস্তবে ফিরে আসি এবং লক্ষ্য করি বাক্কা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। কাজী ও চেলা-১ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দ্রুত প্রস্থান করে। বাক্কা টেনে হিঁচড়ে ফাইটারের মৃতদেহের দিকে এগোয়। তখন তার মুখে সেই পুরাতন সংলাপটি।)

বাক্কা (টেনে হিঁচড়ে ফাইটারের মৃতদেহের দিকে যেতে যেতে মরণ যন্ত্রণায়) চা দে-টোস বিস্কুট দে—আমি চায়ের মইদ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া খামু—আমি চুবাইয়া চুবাইয়া খামু—আমি—

[এখনও ক্রীতদাস-আবদুল্লা আল মামুন]

১২

রাবদাশ ক্যান, তুমি তারে নেশা করনের টেকা দিতে না? দিতে এই জন্যি য্যান সে নষ্ট হয়। রাত্রে তুমি তারে তোমার ঘরে তুইলা নিতে ক্যান? পরথম পরথম কানতো সে। কানতো না?

সুবল ঘোষ এসব কথা ইখানে ক্যান, এ্যাঁ? নদীর কিনারে বসে লোক জড়ো করতি চাও? ঠিক আছে। আজ আর কাল এই দুইদিন পাট করে যদি দল থেকে যাতি চাও টেকা পয়সার বুঝ করে চলে যাও।

রবিদাশ হ্যাঁ। তাই করব।

সুবল ঘোষ বনশ্রী? বনশ্রী ইখানে এসেছ ক্যান? যাও ছাওনীতে যাও। কি হলো, বাজারের লোক জড়ো করনের মতলব আছে নাকি, হ্যাঁ?

[শ্যামল কালো চমৎকার দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী বনশ্রীবালা দৃঢ় পায়ে সোজা রবিদাশের কাছে চলে আসে।]

সকাল এগারটা পর্যন্ত ঘুমাতে বলেছিলাম। এখন দশটাও বাজে নাই (ঘড়ি দেখে বলে)। কাল রাত্রে আসরটারে ভালই ডুবাইছ। কিছু বলা যাবে না, বললে ছ্যাৎ কইরা উড়ে। এষ্টিং করে, আমার ঘণ্টা করে।

[সুবল গজর গজর করতে করতে চলে যায়]

বনশ্রী ছায়া কোথায়?

রবিদাশ জানি না। দেখি নাই তারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনশ্রী	এনায়েত বলল কাল সারারাত গাঁজা খেয়েছে সে। তারপরে সক্কালে উঠে বারায়ে পড়েছে। রাতে ভাতও খায় নাই।
রবিদাশ	হুম্।
বনশ্রী	এত বিষ খাইলে আয়ু ক্ষয় হবে। তা ওরে বলবে কে? ...আর বললেও লাভটা কি হবে।
	[চলে যেতে পা বাড়িয়ে একটু থামে।]
	রবি দা।
রবিদাশ	কি?
বনশ্রী	আপনে আমার উপরে রাগ করেছেন? (থামে) নইলে রাজবাড়ি থেকে একত্তরে আসেন নাই ক্যান? সুবল ঘোষ ধমক দিয়া আমার কাছ থিক্যা সব কাজ আদায় কইরা লয়। আপনে পারেন না?
রবিদাশ	মনের উপর জোর খাটে না।
বনশ্রী	আমার মনের কতটুকুন জানো রবি দা?
রবিদাশ	থাক সে কথা। দুকখু থাকে, মানুষের বিপজ্জয় আসে। কিন্তুক তারে সহ্য করনের ক্ষমতা নাই তোমার?...কাল মদ খেয়েছিলে ক্যান?
বনশ্রী	(এবার খিল খিল করে হাসে) সুখে রবি দা। কিত্তনখোলা আড়ং, এত লোকজন, নাচগান দেইখা আর সুখ চাপতে পারি নাই। মন বদলাতে হলে রূপটাও বদলাতে হয়। নাইলে কাজ হয় না।
রবিদাশ	হুম।
বনশ্রী	ইহ, তুমি য্যান জানো না, কি হয়েছিল কাল। তা কনটাকটর সাবেরে নাচ দেখালাম। ননীবালা গান ধরল : ছাঁইয়া দিল মে আনারে (বলে প্রসারিত হাতে টাক করে তালি দেয়)... তুমি আসো নাই ক্যান রবি দা?
রবিদাশ	বনশ্রী। তুমি ফাইজলামি কর, সেটা তোমার জিনিস। আমার সুখ দুখ বইলা একটা কথা আছে।
বনশ্রী	আছে? হি হি হি। বুঝতি পারি না।...এট্টু বসব পাশে? (বসে পড়ে)...উই, উই যে নাও দেখি। ও মা, মেয়ি মানুষও দেখতিছি—অ, বাইদ্যারগো নাও রবি দা, এ্যাঁ।
রবিদাশ	হ্যাঁ। (রবিদাশ চোখে চোখে তাকায়। বনশ্রী বুঝতে পারে, রবিদাশ কোমল ও আর্দ্র হয়েছে) এইখানে এভাবে বসনটা ঠিক না।
বনশ্রী	হি হি হি। আমার দেবতার কাছে বসব, মানুষের কি এ্যাঁ?...উই পাড়ে...আচ্ছা এত নদীর নাম লউজং না?...চল উই প্যাড়ে আমরা এট্টু বেড়ায়ে আসি। চুপচাপে, ছায়া যাতে জানতি না পারে।...হি হি হি।
রবিদাশ	আমার মনে হিংসা নাই।
বনশ্রী	ক্যান আমারে নিয়া সংসার করতে ইচ্ছা হয় না তোমার? আমার চুল দিয়া রোজ দুইবেলা পা মুছায়ে দেব তোমারে। সিঁথি ভরা সিন্দুর পরব।
রবিদাশ	আমি তোমার ভাল চাই বনশ্রী...সংসার আমার ছিল। যাত্রার নেশায় সেই সংসার ভাইস্যা গেছে। সব তুমি জানো।...তুমি ভাল থাক। পুণ্যির পথে থাক, আমি সিটা চাই।...তোমারে থানাপাড়া থিকা তুলে আনছিলাম একদিন। পাপ থিকা বারায়া আসছিলা পাপের মধ্যি ফিরা যাইতে না।
বনশ্রী	রবি দা, মটরশুটির ক্ষেত দেখলে আমার ইচ্ছা করে আঁচল ভইরা কচি মটর তুলি—আর কচ কচ কচ কচ কইরা দিনভর খাই।... পুষ্প দিদিও পছন্দ করত। আহা রে—পুষ্প দিদির মরণটা যদি দেখতে! সেই পাড়াটায় এ্যাক বচ্ছরের মাথায় পুষ্প দিদির গায়ে ক্ষত হলো। পুষ্প দিদি নুকায়ে রাখত আর আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কানতো। (বলে বনশ্রী চোখ মোছে)।

রবিদাশ — আহ্ থামো।

বনশ্রী — একদিন জনমের জন্যি থামবো। তখন কি করবে? হি হি হি। রবিদা, তুমি কাছে থাকলে আমার ভয়ডর কইমা যায়।...সুবল দাদা কয় কি জানো রবিদা? কয় যে, আমি যদি তার কথা মতন না চলি দলটা ভাইঙ্গা যাবো।

রবিদাশ — হুম, তারপর।

বনশ্রী — দল ভাঙ্গলে আমি কোথায় যাব?

রবিদাশ — এইসব আমারে শোনাও ক্যান? চুপচাপ বসে থাক।

বনশ্রী — ঠিক আছে। চুপ করব। তা সকাল থিকা নাকার উঠতিছে, এট্টু টক খালি পরে আরাম লাগতো। আমারে এট্টু লেবু নয় তো তেঁতুল দেও রবিদা।

রবিদাশ — লও। দুইটা আমলকী আছে।

[পকেট থেকে বের করে দেয়।]

বনশ্রী — (লুফে নিয়ে বুকের কাছ নেয়। হাতে ঘষে) আহ্, আমলকী। (খুঁটে নিয়ে শুঁকে)। রবিদা, তুমি আমার দেবতা। যখন যা চাই তোমার কাছে পাই।...যা চাই না—তাও পাই।

রবিদাশ — (মৃদু হাসে) সেটা কি? যা চাও না তবু পাও।

বনশ্রী — ঘেন্না। তোমার ঘেন্না।

রবিদাশ — হইছে। এইবার চুপ কর।

বনশ্রী — আমার খাওয়া খাবে, এঁটো খাবে?...ছোট-জাতের এঁটো? হি হি হি।

রবিদাশ — (হাত বাড়িয়ে নেয়)—ফলটা একই জাতের।

বনশ্রী — (খেতে খেতে) এট্টা ফলের মধ্যি এত রঙের সোয়াদ ক্যান। কষটা লাগে, চুকা লাগে, নোনতা লাগে, বেশি চাবাতি গেলে লাগে তিতা—

রবিদাশ — ফলটা তোমার মতো। এক সোয়াদ থিক্যা আরেক সোয়াদে লাফায়া বেড়ায়। কোনটা যে ঠিক, আসল কওন যায় না।

বনশ্রী — আচ্ছা।—এর মানিটা হচ্ছে আমি খারাপ।

রবিদাশ — না খুব ভাল।

বনশ্রী — কবিরাজে কয়—আমলকী রক্ত সাফ করে। আচ্ছা তুমি যখন ভিখিরীর ছেলের মধ্যি জীবন জীবন রে বলে চীৎকার কর, তখন আমার ইচ্ছা করে মরে যাই। 'জীবন' কিসের নাম? কোন পালাকার লিখেছে এই ডাইলগ? খাও খাও, বাহ খাও।...যখন ডাকো কোন মানুষ আসে না। বিবেক দেওয়ান আসে না, এনায়েত আসে না। শূন্যি আসরে কারে ডাক তুমি? কাল রাতে আমার ইচ্ছা হল ছুইটা গিয়া বলি : এই তো আমি বনশ্রীবালা। তুমি কও, যখন ডাকতিছ নাম ধরে, সেই নামের কোন মানুষ নাই। তখন কেমন লাগবে? খারাপ লাগবে না?

রবিদাশ — ওঠ। ছাওনীতে চল। (উঠে দাঁড়ায়)।

বনশ্রী — ছায়া—এই যে ছায়া ভাই। আসেন আসেন।

[সোনাই ও ছায়ার প্রবেশ।]

রবিদাশ — ছায়া। কোথায় ছিলে সারা সকাল? (ছায়া নিরুত্তর।) যাও রেস্ট লও।..বনশ্রী, ওরে ঘরে নিয়া যাও।—দলের পেস্টিজ ডুবাবে সিটা পছন্দ করি না।

বনশ্রী — থাক। ওরে বইকো না।

রবিদাশ — আমি চা খাতি গেলাম। (প্রস্থান)

[কিত্তনখোলা—সেলিম আল দীন]

~ www.amarboi.com ~

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. Improvement of Voice & Diction— J. Eisenson
২. Voice and the Actor— Cicely Berry
৩. Theatre Games— Clive Barker
৪. The Voice Book— Michael Mc Callion
৫. Towards a Poor Theatre— Jerzy Grotowsky
৬. Responsible Public Speaking—Patton Giffin Linkugel
৭. An actor Prepares— Constantin Stanislavsky
৮. Voice and speech in Theatre— J. Clifford Turner
৯. Voice and Speech— Malcom Morrison
১০. The Performers And The Director—Irene M. Franck and David M. Brownstore
১১. Speech Practice Manual—Robert L. Keith & Jack E. Ehomas
১২. The Theatre An Introduction —Oscar G. Brockett
১৩. The Stage and the School— Katharine Anne Ommanney & Harry H. Schanker
১৪. Your voice and How to use it successfully— Cicely Berry
১৫. আবৃত্তি-কোষ—নীরদবরণ হাজরা
১৬. স্বর ও বাকরীতি—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
১৭. স্বর ও শ্রুতি—অমরনাথ মল্লিক
১৮. নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি (অনুবাদ ও সম্পাদনা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৯. নৃত্ত-নৃত্য-নাট্য—স্নিগ্ধা পাল
২০. অভিনয় শিল্প : সংলাপ ও কণ্ঠস্বর—অনজন দাশগুপ্ত
২১. প্রসঙ্গ : নাট্য—শম্ভু মিত্র
২২. অভিনয় শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা—অশোক সেন
২৩. আবৃত্তিচর্চা—উৎপল কুণ্ডু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~